"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

আমার পরমারাধ্য

পিতৃদেব

৺ হরিশ্চন্দ্র রায়

মহোদয়ের

চরণকমলে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ

ভক্তি সহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত ভৃত্য

সত্য।

# সূচীপত্র।

—ঃ০ঃ—

# অবগুণ্ঠিতা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### গৌরীতটে।



আমি দরিদ্র। কমলিনী কোহিনুর। বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার আমার এই ব্যর্থপ্রয়াস কেন? লজ্জাবনতা, বিনয়নম্রা কমলিনী যেন কোন আদর্শ শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত চিত্র। এই ললনা ললাম অসীম সৌন্দর্য্যের অধীশ্বরী। রূপে, গুণে, ধনে আমি কাঙ্গাল। কাঙ্গালের প্রাণে কেন এই অনাস্বাদিত প্রেমসঞ্চার? না জানি কখন কোন্ অলক্ষিতভাবে ভালবাসা মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। দার্শনিকের স্তূপীকৃত যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, সময় অসময়, বয়ঃপার্থক্য, মান-সম্ভ্রম, হিতাহিত বিচার না করিয়া উহা আপনা-আপনি, জানিতে না জানিতে, বুঝিতে না বুঝিতে, হৃদয়ে সঞ্চারিত

হইয়া ধনী-নির্ধনকে প্রেমের বস্তু পাইবার জন্য পাগল করিয়া তুলে। কত মহাসংযমী ধ্যানস্তিমিতনেত্র জ্ঞানে বৃহস্পতি সর্ব্বতত্ত্বদর্শী ঋষি প্রেমমোহিত হইয়া ইহকালের অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখলালসায় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বস্বত্যাগী শিব কন্দর্পের ফুলবাণে পীড়িত হইয়াছিলেন। আমরা তো ক্ষুদ্রশক্তি সসীমবুদ্ধি মানব। দুইটি ঢল ঢল চক্ষু আমাদিগকে যে উদ্‌ভ্রান্ত করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আর এক কথা। সুন্দর একটি ফুল ফুটিলে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; দেখিয়া দেখিয়া দেখিবার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না, তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিতে বাসনা হয়, সে ভাব কি দূষণীয়? উপভোগ দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না, ইহা কাহার অবিদিত? কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কে কবে সৌন্দর্য্যপানে বিরত হইয়াছে? আকাশের সান্ধ্যতারা আকাশে প্রস্ফুটিত যূথিকা। সেই সান্ধ্যতারা দেখিয়া প্রাণে যে আনন্দ-লহর ছুটে, তজ্জন্য কাহাকে দোষ দিব? পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর দেখিয়া সাগরের হৃদয়ে যে আবেগোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা কি সাগরের দোষ? সুন্দর ভাবময় একখানি মুখ দেখিয়া যদি হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রবাহ ছুটে, সে দোষ কি মানবের? দেখিয়া দেখিয়া যদি দেখিবার সাধ না মিটে, সে দোষ কি মানবচক্ষুর? যদি বল, ইহা দূষণীয়, তবে

সে দোষ অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃজনকারী, সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্য-বিধানকারী বিধাতার। কমলিনীর প্রতি আমার এই অচিন্ত্য পবিত্র প্রণয় কখনই দোষাবহ হইতে পারে না।

এইরূপে সুধীরকুমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীকূলে বসিয়া মনে মনে নানারূপ তর্কের সমাধান করিতেছিলেন। মোহনপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার উত্তরে স্বচ্ছতোয়া প্রবাহিণী গৌরী। কাশীপুরের সদর নায়েব গৌরবিনোদ ঘোষের বাড়ী এই গৌরীতটে। তাহারই পার্শ্বে সুধীরকুমারের বাড়ী। সুধীর এবার বি, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার পিতা প্রভূতধনশালী সহৃদয় ব্যবহারজীবী ছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি লোকান্তরিত। দানবীর হরি-মোহনের মৃত্যুর পর হইতে সুধীরকুমারের স্কন্ধে সংসারের সকল ভার পড়িয়াছে। অপরিমিত দান করিয়া, বহু আশ্রিত প্রতিপালন করিয়া, হরিমোহন তাঁহার পরিবারবর্গকে নিঃস্ব-অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে অকাতর, অধ্যবসায়সম্পন্ন সুধীর সে জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা স্বাবলম্বনে, ভগবৎকৃপায়, বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন; তিনিও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল হইবেন। সংসারের

এতগুলি লোক নিরন্ন হইয়া মারা পড়িবে, ভগবানের এরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না।

সুধীরকুমারের আকৃতি মনোহর,—নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, বর্ণ অনিন্দ্য গৌর, কেশ চিক্কণ, কর্ণদ্বয় সুদৃশ্য, ললাট প্রশস্ত ও সৌভাগ্যশংসী, ভ্রূযুগল সংযুক্ত, নয়নদ্বয় বিস্তৃতায়ত ও উজ্জ্বল,—তাহাতে অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অপরিসীম পাণ্ডিত্য, অপ্রতিহত সঙ্কল্প, অভাবনীয় উদারতা এবং অকৃত্রিম স্নেহ, করুণা ও প্রেমপ্রবণতা নিয়ত প্রতিভাত হইত, নাসিকা উন্নত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, গুম্ফরেখা কৃষ্ণ ও বঙ্কিম, গণ্ডদ্বয় রক্তিমাভ ও অণ্ডবৎ, অধর পদ্মকোরকনিভ, চিবুক দ্বিধাভিন্ন। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘবিলম্বী ও মাংসল, কটি ক্ষীণ এবং সর্ব্বাবয়ব পরিপুষ্ট। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি উচ্চবংশসম্ভূত, মহানুভব, সুশিক্ষিত, ভাগ্যবান্ যুবক। সুধীরের বয়ঃক্রম একবিংশ।

গৌরীতটে সুধীরকুমার যখন তদ্গতচিত্তে প্রেমচিন্তা করিতেছিলেন, তখন পশ্চাৎ হইতে এক ললিতলাবণ্যময়ী, কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনা বালিকা তাঁহার নেত্রদ্বয় চাপিয়া ধরিল। যুবক তখনই আগন্তুকের হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কমল, তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।" বালিকা খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন জ্যোৎস্নামণ্ডিত রজতনিভ

ক্ষুদ্রতরঙ্গগুলিও মৃদুমন্দবায়ুসঞ্চারে খল খল করিয়া হাসিতেছিল। নিদাঘের সন্ধ্যা পরম রমণীয়। তাহাতে আবার পূর্ণকল শশাঙ্ক সুধাময় কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে নীলাকাশে উদিত হইলেন।

নদীর দুই ধারে বাঁশ, বেতস ও বাবলা গাছই অধিক। গাছের পাতাগুলি ঈষৎ সমীরণভরে পুলকে হেলিতে দুলিতেছিল। নগ্নমূর্ত্তি প্রকৃতি তখন বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রকৃতির এই নীরব সৌন্দর্য্যের অব্যক্ত মধুরতার ভিতর নির্ঝরিনীর সায়ংকালীন মঙ্গলনিক্বণ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে একটা পেচক কর্কশ রব করিতেছিল। সুধীর ও কমলিনী তখন প্রণয়ের মোহে আত্মহারা। উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বাল্য হইতে তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে মিশিতেন।

কমলিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ। কৈশোর ও যৌবনে তখন প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তাঁহার অবয়ব সুগঠিত ও কোমল, কেশদাম চিক্কণ, মসৃণ, কুঞ্চিত ও উরুস্পর্শী, ভ্রূধনু সান্দ্র, নয়নদ্বয় আকর্ণবিশ্রান্ত, মনোজ্ঞ ও ভাবময়, নাসা তিলফুলবিনিন্দিত, গণ্ডদ্বয় আরক্তিম, অধরোষ্ঠ রক্তরাগরঞ্জিত, দশনপংক্তি দাড়িম্ববীজসদৃশ দ্যুতিময়, বক্ষঃদ্বয় ঈষৎ উন্নত, নাভি সুগভীর, কটি কৃশ, নিতম্বদেশ করেণুর ন্যায়

স্থূল ও মনোহর। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আভরণাতিশয্যে সুন্দরী নবযৌবনগর্ব্বিতা কামিনীগণের শত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। শৈশবে মাতৃহীনা হওয়ায় বালিকার মুখমণ্ডলে কেমন এক অস্ফুট বিষাদের ছায়া সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সেই ছায়াসম্পাত তাঁহার অভিরাম মুখশ্রীতে চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। কমলিনীর হৃদয় কোমল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, শিক্ষা প্রশস্ত। তাঁহার হাসিতে জ্যোৎস্না খেলিত, অশ্রুতে মুক্তা ঝরিত, কথায় অমৃত বর্ষণ হইত, চাহনিতে হৃদয় প্রফুল্ল করিত ও গমনে মরাল পরাজিত হইত। এক কথায়, কমলিনী রমণীরত্ন।

পার্শ্বস্থিতা বালিকাকে সুধীর কৃত্রিম ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "কমল, সন্ধ্যার সময় এখানে একা আসিলে কেন?"

কমলিনী তাঁহার উজ্জ্বল প্রেমময় দুইটি চক্ষু সুধীরের চক্ষুর উপর রাখিয়া কিঞ্চিৎ অভিমানের সহিত কহিলেন, "তুমি কেন আমাকে না জানাইয়া এখানে একা আসিয়াছ?"

যুবক মুগ্ধা বালিকার নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আরও নিকটে লইয়া কহিলেন, "তা' আমার ঘা'ট্ হইয়াছে, কমল! আর কখন তোমাকে না কহিয়া আসিব না।"

বালিকার মুখমণ্ডলে সন্তোষের ভাব প্রকটিত হইয়া

তাঁহার স্বভাবসুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। মন্ত্রমোহিত যুবক তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "কমল, তুমি নিরুপমা।"

কমলিনী সুধীরকে বাধা দিয়া কহিলেন, "যাও, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।"

সুধীর। বেশ, যে সুন্দরী, তাহাকে সুন্দরী বলিলে বুঝি ঠাট্টা করা হয়?

কম। তাই ত, আমার রূপ ত ছাপিয়া পড়িয়াছে!

দূরাগত কোকিলকূজনের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র 'তাই ত' কথাটি সুধীরের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' ও তাঁহার প্রাণ আকুল করিল। অমন করিয়া আর কেহ 'তাই ত' বলিতে পারিত না। যে সেই 'তাই ত' একবার শুনিয়াছে সে উহার মধুরতা ভুলিতে অক্ষম।

সুধীর আবেগভরে কহিলেন, "সত্য, কমলিনি, তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আমার মনে হয়, তুমি কোন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা, তুমি অপ্সরা।"

কম। আমি একটা পেত্নী।

সুধীর। আমার চ'খ্ দিয়া দেখিলে ও তুনিয়া শুদ্ধ লোকের কথা বিশ্বাস করিলে বুঝিতে পারিবে, আমি তোমার অন্যায় প্রশংসা করি নাই।

কম। লোকে কি না বলে!

সুধীর। শুন কমল, লোকে যে চন্দ্রবদনের খুব সুখ্যাতি করে, আমার কিন্তু বোধ হয়, তোমার মুখখানি চাঁদের চেয়েও সুন্দর। এতক্ষণ চাঁদের আলোতে বসিয়া আছি, তবু প্রাণ শীতল হয় নাই। যেই তুমি আসিয়াছ, অমনি আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। জানি না, তোমার মুখখানিতে কি যেন কি মাখান আছে, দেখিলেই মনে আনন্দসঞ্চার হয়, সকল ভাবনা দূর হয়।

কম। আজ যে বড়, কবির মত উপমা দিয়া কথা কহিতেছ, আর এই পোড়ামুখীর মুখখানিতে নানা সৌন্দর্য্য দেখিতেছ। ব্যাপারখানা কি?

সুধীর। কমল, এমন সৌন্দর্য্য পান করিলে নিরক্ষরও কবি হয়, বোবাও কথা কয়। যতই তোমাকে দেখি, ততই যেন বোধ হয় তোমার ভিতরে আরও কত অনাবিষ্কৃত মাধুরী লুক্কায়িত আছে।

কম। তোমার ওসব কবিতার ভাষা এখন রাখ। মন খারাপের কথা বলিতেছিলে, তাই বল শুনি। এই হতভাগিনীর কাছে তো মনের সব কথা খুলিয়া বলিবে না।

সুধীর। তোমায় বলিব না? তোমার কাছে লুকাইবার কি আছে, কমল? প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে যাহাকে ভালবাসি,

যাহাকে আমার এই দগ্ধ-হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া মনে করি, তাহার কাছে কি লুকাইব, কমল? আজ কয়েকদিন হইল আমার কেবল মনে হইতেছে, তোমায় বুঝি আমি পাইব না,— কমল, তুমি বুঝি আমার হইবে না! আমি অকুলীন, আমি নির্ধন; জানিয়া শুনিয়া কে আমার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিবে? আর, আমাদের মিলনে অন্তরায় অনেক। নির্গুণ পাত্রে কন্যা দান করায় কে না প্রতিবাদী হইয়া থাকে? তোমারও অনেক ভাবিবার আছে। আমার ন্যায় হতভাগ্যের সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তুমি কেন কষ্টভোগ করিবে? আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না। কিন্তু কমল, আমি তোমার নিকট একটি ভিক্ষা চাই। আমাকে কখনও ভুলিও না। তুমি আমার হৃদয়ে যে পবিত্র প্রণয়ের হোমাগ্নি জ্বালিয়াছ, সে প্রেম হইতে যেন এ অধমকে বঞ্চিত করিও না।

আবেগের সহিত কমলিনী কহিলেন, "তোমাকে ভুলিব? হৃদয় চিরিয়া যদি দেখাইবার হইত, তবে দেখাইতাম—এ হৃদয়ে সুধীরকুমারের মূর্ত্তি ব্যতীত অপর কাহারও মূর্ত্তি স্থান পায় নাই। জানিও, কমলিনী তোমারই চরণের দাসী। সে তোমা ছাড়া আর কাহাকেও প্রাণ সমর্পণ করিবে না। রূপে, গুণে, বিদ্যায় এমন উপযুক্ত পতি কয়জন লাভ করিতে পারে? তুমি

অকুলীন? তবে কুলীন কে? আমি বালিকা; কুললক্ষণ জানি না। কিন্তু যতদূর বুঝি, তাহাতে দেখিতে পাই, কুলীন-নামধারী অনেক গুণহীন পাষণ্ড কৌলিন্যের বড়াই করিয়া বাজারে বিক্রীত হইতেছে। অথচ, প্রকৃত গুণবানের আদর নাই। তুমি বলিলে, তুমি নির্ধন। এত গুণের আধার যে, সে যদি নির্ধন হয়, তবে প্রকৃত ধনী কে?”

কমলিনীর আজ মুখ ফুটিয়াছে। এতকাল উভয়ে কেবল প্রণয়সুখে মগ্ন ছিলেন। কখনও যে বিচ্ছেদ হইবে, সে চিন্তা কাহাকেও আকুল করে নাই। আজ কয়েক দিন হইল সুধীর-কুমারের মানসচক্ষে যেন অদূরবর্ত্তী চিরবিরহের ছায়া প্রতিভাত হইতেছিল। কমলিনী হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী যুবককে যখন তাঁহার গভীর প্রেম জানাইতে-ছিলেন, তখন মুগ্ধ সুধীর বালিকার মুখশ্রীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে তাঁহার অমৃতময় কথাগুলি শুনিতে-ছিলেন। ক্ষণিক উত্তেজনায় বালিকার রক্তিমাভ গণ্ডদ্বয় আরও আরক্তিম হইয়াছিল। সে মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সুধীর বিহ্বল হইলেন।

কিয়ৎপরে বালিকা লজ্জানম্রস্বরে কহিলেন, “দেখ, এখানে এমনভাবে অনেকক্ষণ থাকিলে লোকে কি বলিবে? এখন আসি।” তখন দূর হইতে প্রেমবিহ্বলকণ্ঠে কে গাহিতেছিল,

"কি করে লোকেরি কথায়।" সুধীর কমলিনীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর বালিকা সুধীরকে কহিলেন, "ঐ দেখ, দূর হইতে একখানি বজরা আসিতেছে। উহাতে বোধ হয় বাবা আসিতেছেন। আমি এখন আসি। আর একটু ক্ষণ এই-ভাবে থাকিলে, লোকে দেখিয়া কি বলিত, বল দেখি? তুমি বড়ই অবুঝ হইয়াছ।"

সুধীর। লোকে দেখিলে বলিত, কমলিনী সুধীরকে জীবন সমর্পণ করিয়াছে।

"যাও!" বলিয়া বালিকা তাঁহাদের ঘাটে ছুটিয়া গেলেন।

এমন সময়ে বজরাখানিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে বৃহত্তর দেখা গেল ও মাঝিদের দাঁড়ের দূরাগত শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। সুধীর তখন ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বজরা ঘাটে পঁহুছিল। বালিকা "বাবা আসিয়াছেন" বলিয়া আনন্দে বজরার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। কিঞ্চিৎ গোলযোগ শুনিয়া নায়েব মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কালীতারা বর্ণে ও কণ্ঠস্বরে বায়সকে পরাভব করিয়া তথায় শুভাগমন করিলেন। "আমার জন্য কি আনিয়াছ?" বলিয়া নায়েব-ঘরণী পতিকে প্রথম সম্ভাষণ করিলেন। ঘোমটা

দ্রুতগতি তোরঙ্গ হইতে এক ছড়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মুক্তামালা বাহির করিয়া দিলেন। নায়েব মহাশয় বুঝিয়াছিলেন, কথা হইতে কাজ অধিকতর মূল্যবান্। কিন্তু তিনি কন্যার জন্য কিছু আনিয়াছিলেন কি? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, কিছুই না।

মুক্তামালার শীতলস্পর্শে নায়েবপত্নীর উগ্রমূর্ত্তি কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধভাব ধারণ করিল। তিনি সানন্দচিত্তে পতির অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, পিছনে কমলিনী, শেষে দ্রব্যসম্ভারসহ দলবল। কালীতারার হৃদয়ে যখন আনন্দ আর ধরিল না, তখন দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার অট্টহাস্য প্রতিবেশিনীগণের কর্ণকুহর বধির করিয়া জানাইল, রণচণ্ডী আজ পতির সেবায় তুষ্টা হইয়াছেন। সে ধ্বনি শুনিয়া মাতৃকোলে শিশুগণ কাঁদিয়া উঠিল, বালকেরা ভীত হইল, ও যুবতীরা মনে করিলেন, পতিবশীকরণের অমোঘ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---

### নায়েব মহাশয়ের সংসার।

নায়েব গৌরবিনোদ ঘোষের সংসার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কালীতারা, প্রথম পক্ষের কন্যা কমলিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল, দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক উমেশচন্দ্র, অতি বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য মতিসিং এবং অনেক দাসদাসী ও গালপাট্টাবাঁধা দরওয়ানে তাঁহার বাটী সর্ব্বদা অলঙ্কৃত।

নায়েব মহাশয় খর্ব্ব, স্থূলকায়, প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, প্রকৃতি রুক্ষ। পক্ককেশ ঘোষজাকে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য সকলে ভয় ও সম্মান করিত। পল্লীগ্রামে ও নিজ পরগণায় তিনি নরসিংহ। মোটামুটি তাঁহার দুই পক্ষ; প্রথমটি ছিলেন গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী,—কাজেই শুক্লপক্ষ। দ্বিতীয়টি, ঘোরতর কৃষ্ণপক্ষ। কমলিনীর মাতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই ঘোষজা কালীতারাকে বিবাহ করেন। কালীতারা ভিতরে বাহিরে কালো। দরিদ্রকন্যা হঠাৎ বিপত্নীক ধনবান নায়েবের দ্বিতীয় পত্নী হওয়ায় ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন। অবয়ব কৃশ

হইলেও তাঁহার বুদ্ধি বিশেষ স্থূল ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রতারণা করা কুচক্রীর পক্ষে অনায়াসসাধ্য। ভগবান্ তাঁহাকে সুন্দরী করিয়া না গড়িলেও নানাবিধ বিলাসোপকরণে প্রকৃতি-দত্ত কাঠামখানির উপর কারিগরি করিতে যৌবনগর্ব্বিতা কালীতারা স্বল্প প্রয়াস করেন নাই। মেঘে বিজলীর ন্যায় তাঁহার মুখে কদাচিৎ হাসির রেখা দেখা দিত। গৃহকর্ত্রীর মুখমণ্ডল প্রায়শঃ প্রাবৃটে আচ্ছন্ন থাকিত। অশ্রুপাত ও তর্জ্জন, বারিপাত ও মেঘগর্জ্জনের স্থল অধিকার করিয়াছিল। মা কালীর হুঙ্কারে সন্ত্রস্ত হইত না এরূপ কেহ মোহনপুরে ছিল না। কালীতারার বয়স এক্ষণে সপ্তবিংশ।

ঘোষজার সংসারে দ্বিতীয় রত্ন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল। নন্দলালের শরীর দৃঢ়, চক্ষু কোটরগত ও সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণ। স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্যই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অবধি নন্দলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বাটীতে প্রতিপালিত হয়েন। এ পর্য্যন্ত অন্নচিন্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। নন্দলালের পিতা অগ্রজ গৌরবিনোদের সহিত একান্নবর্ত্তী না থাকিলেও ঘোষজা নন্দলালকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বাৎসল্যের আতিশয্যে ও সুশাসনের শৈথিল্যে তাঁহার গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষা গ্রাম্যপাঠশালার সীমা অতিক্রম করে নাই।

নন্দলালের বয়স পঞ্চবিংশ। এরূপ গুণবান জামাতা লাভ করিতে কেহ এ পর্য্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ না করায় তিনি এখনও অবিবাহিত।

নন্দলালের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি কিছু ছিল না। তাঁহার পিতা স্বয়ং অকৃতী হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রতি হিংসা দ্বেষ ও তাঁহার অপবাদ ঘোষণাতেই নিজের মূল্যবান্ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। মোহনপুরের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ বাটী ও বিপুল সম্পত্তি নায়েব মহাশয়ের স্বকৃত। এতদ্বাদে জনরব যে, ঘোষজা বাটীনির্ম্মাণকালে এক লক্ষ টাকার মোহর খুঁড়িয়া পান। বিজ্ঞ লোক লব্ধ কখনও ত্যাগ করেন না, কাজেই বৃদ্ধ গৌরবিনোদ এ পর্য্যন্ত পরের চাকুরি করিতেছেন। নন্দলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বিভবসম্পত্তির বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি আরও জানিতেন, এই ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী, —কালীতারা ও কমলিনী। আর নন্দলাল? পরান্নপালিত আশ্রিত সেবক মাত্র। এ পরিবারের সামান্য পিত্তলখণ্ডেরও তিনি অংশভাগী নহেন। ঈর্ষায় নন্দলালের অন্তর্দাহ হইত। কিরূপে কালীতারাকে প্রতারণা করিয়া তিনি অতঃপর সকল বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। কমলিনীর মাতার নামে যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, ঘোষজার গৃহে শুভাগমনের পর তাহার অধিকাংশ

কালীতারা আপনার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও প্রভূত বিষয় তাঁহারই নামে ক্রীত হয়। নায়েব মহাশয় কোনও সম্পত্তি নিজ নামে ক্রয় করিতেন না। বাস্তুবাটী পর্য্যন্ত কালীতারার নামে লেখাপড়া হইয়াছিল। এক্ষণে নন্দলালের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আবশ্যক,——অবিশ্রান্ত সেবায় কালীতারার মনস্তুষ্টি সম্পাদন ও সুধীরকুমারের সহিত কমলিনীর বিবাহে প্রতিবন্ধকাচরণ; কেননা, বুদ্ধিমান সুধীর নন্দলালের সকল চক্রান্ত বিফল করিতে পারেন।

তৃতীয় রত্ন, উমেশচন্দ্র। কিঞ্চিৎ গোমেশ বলিয়া ও বুদ্ধির বিশেষ তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সমবয়স্কেরা তাঁহাকে মেশ (?) বলিতেন। এক কথায়, উমেশচন্দ্র "আকারসদৃশ প্রজ্ঞঃ"। তিনি অস্তিত্বহীন সুপ্তজীবের ন্যায়, ব্যাকরণে লুপ্ত হকারের ন্যায়, ভগ্নীর বাটীতে শোভা পাইতেন। দিদির আদরের জন্য হউক অথবা মস্তিষ্কের অভাবের নিমিত্ত হউক, উমেশচন্দ্রের সহিত সরস্বতীর বাল্যেই বিসংবাদ হইয়াছিল। তিনি বাঁয়া তবলার ন্যায় সর্ব্বদা নন্দলালের সহিত বিরাজ করিতেন। বঁধু ন্যায়ান্যায়, সম্ভব অসম্ভব যাহা বলিতেন, উমেশ যন্ত্রবৎ তাহাই করিতেন। নন্দলালের গম্বুজাকৃতি বপু দৃষ্টে মুগ্ধ উমেশ বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে সর্ব্বদা ভাগিনেয়ের অনুগামী হইতেন। নন্দলাল তাঁহার মন্ত্রণায় গুরু ও সর্ব্বকার্য্যে সারথি। কলুর

যেরূপ বৃষভ সহায়, রজকের যেরূপ রাসভ সহায়, গোপের যেরূপ গোধন সহায়, নন্দলালের তেমনি উমেশ সহায় ছিলেন। উমেশচন্দ্রের দুইটি প্রধান গুণ ছিল,—(১) দলিল পত্র জাল করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, (২) অযাচিতভাবে মিথ্যা-প্রচার করিতে এবং অন্যায় আচরণ করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

ঘোষজার পরিবারে প্রভুভক্ত একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তাহার নাম যদুসিং। সে বাটীর একজন অভিভাবকস্থানীয়। যদুসিং নন্দলাল ও কমলিনীকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। শ্যালক মহাশয়ও তাহার নিকট অনেক প্রকারে ঋণী। ঘোষজার বাটীতে কাজ করিয়া সে চুল পাকাইয়াছে। তাহার নিজের স্ত্রীপুত্রদুহিতা কেহ ছিল না। মাতৃহীনা কমলিনীকে যদুসিং প্রাণের অধিক স্নেহ করিত। পরের জন্য এত কর কেন জিজ্ঞাসিলে, বৃদ্ধ কহিত, "কমল যে আমার বেটী"।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## আশা মিটিল না।

কমলিনী বড় আশা করিয়াছিলেন, সুধীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। বলিতে হইবে কি, রমণীগণ পুরুষাপেক্ষা অনেক অল্প বয়সে প্রেমে আত্মহারা হইয়া থাকেন? বুঝাইতে হইবে কি, সমবয়স্ক বালক বালিকার মধ্যে এ সম্বন্ধে আকাশপাতাল প্রভেদ? স্বভাবকোমলা ললনাদিগের হৃদয়ে প্রেম অতি সহজে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া বসে। তাই অপরিণতবয়সে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে কামিনীরা অপরকে হৃদয় সমর্পণ করেন। পত্নী হইবার সাধ, গৃহিণী হইবার অভিলাষ, স্ত্রীলোক-দিগের জাতিগত। কমলিনীরও সেই বাসনা হৃদয়ে না জাগিবে কেন? তাঁহার মনপ্রাণ চায় সুধীরকে, কেননা, পূর্ব্বেই উভয়ের প্রাণবিনিময় হইয়াছিল। আর, সুধীরের মত সর্ব্বগুণাধার সুপুরুষকে কাহার না ভালবাসিবার ইচ্ছা হয়? স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক কুমারী সুধীরকেই বরণ করিতেন।

এই সংসারে যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না; যে যাহাকে পায়, সে তাহাকে চায় না। এই কঠোর সত্যের উদাহরণ বিরল নহে। তবু কয়জন ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকে? পুরুষকার হইতে ভাগ্য প্রবল। অদৃষ্টের ফল কখনও খণ্ডন হইতে পারে না।

নায়েব মহাশয় বাটী আসিবার কয়েকদিন পর একদা রাত্রে আহারান্তে পরিজনমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া নন্দলালকে কহিলেন, "দেখ নন্দ, কমলের তো তের বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল। আমার একমাত্র সন্তান বলিয়া উহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিই নাই। কিন্তু আর কত বিলম্ব করা যায়? পাড়ার লোকে এখনই জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।"

নন্দলাল কহিলেন, "আমিও এ কয়েকদিন তাহাই ভাবিতে-ছিলাম। কমলকে সৎপাত্রে দান করা বিশেষ চিন্তার বিষয়।"

নন্দলালের কথা শেষ হইতে না হইতে উমেশ কহিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ আছে?"

নায়েব। কিন্তু সৎপাত্র কোথায় মিলে?

কালীতারা। কেন আমাদের হরির মা বলিয়াছে তাহা-দের অঞ্চলে ঢের সুপাত্র আছে। এমন করিয়া মেয়েকে আইবড় করিয়া ঘরে রাখিলে লোকে যে আরো ছি ছি করিবে। এখনই কত লোকে কত কথা বলিতেছে।

নায়েব। গৃহিণি, সাধ করিয়া আমার মাকে ঘরে রাখিয়াছি? মা আমার পরের বাড়ী গেলে আমি যে স্থির থাকিতে পারিব না।

কালীতারা। তবে ঘরজামাই রাখ।

নায়েব। তা, আমি পারিব না। কোনও গুণবান কৃতী পুরুষ ঘরজামাই হইতে চাহিবে না। আমি মাকে এক পাষণ্ডের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না।

কালীতারা। তবে আইবড় করেই রাখ।

ভাবী দ্বন্দ্ব প্রতিহত করিয়া নন্দলাল কহিলেন, "ভাল কুলীনের ঘরে কমলের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সৎপাত্র পাইতে বিলম্ব হইবে না।"

নায়েব। বুঝিলাম, কিন্তু, সুধীরের সহিত কমলের বিবাহ দেওয়া আমার অভিপ্রেত। এমন সৎপাত্র আমার জানিত কুলীনদিগের মধ্যে বিরল। আর, সুধীরের পিতার জীবদ্দশায় আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, সুধীরকে কন্যা সমর্পণ করিব। হরিমোহন রায়ের নিকট আমি অনেক প্রকারে ঋণী। কপর্দ্দক না লইয়া তিনি আমাকে বহুবার কারাবাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

নন্দলাল। হরিমোহন বাবু জীবিত থাকিলে আমি এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতাম না। কিন্তু তাঁহার পরিবার-

বর্গ এখন একেবারে নিঃস্ব, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কোন প্রকারে সুধীরের বি, এ পর্য্যন্ত পড়িবার খরচ সঙ্কুলান হইয়াছে। কিন্তু আর পড়িবার সঙ্গতি নাই। সকলের ভরণপোষণও গুরুতর কথা। আজি কালিকার বি. এ, এম্. এ পাশের দশা তো আপনি অবিদিত নন। সুধীর এ পর্য্যন্ত যতগুলি দরখাস্ত করিয়াছে, শুনিয়াছি তাহার একটিও মঞ্জুর হয় নাই। বড় জোর সে একটি ত্রিশ টাকা বেতনের কাজ যোগাড় করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাতে কি সংসার চলিবে? সুধীরের সহিত কমলের পরিণয় আর কমলকে বিসর্জ্জন দেওয়া একই কথা। মামার কি মত?

উমেশ। আমার মত? জানিয়া শুনিয়া কে গরীবের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেয়? আর এমন গরীব! সামান্য উদরান্নের সংস্থান নাই! লেখাপড়া শিখিয়া যাহা হয় তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। এর চাইতে যে আমাদের গোপী ময়রা, পাঁচু গোয়ালা ও গোবিন্দ পরামাণিক বেশী রোজগার করে।

নায়েব। বেশী রোজগারের উপর মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না। উচ্চশিক্ষার যে কোন ফল নাই তাহা আমি স্বীকার করি না। অর্থ উপার্জ্জনের তুলাদণ্ডে বিদ্যার পরিমাপ করিলে চলিবে না। কুলীর সর্দ্দারও তো অনেক শিক্ষিতের চেয়ে অধিক রোজগার করে। তাই বলিয়া কি সে শিক্ষিত ব্যক্তি

হইতে উন্নত বা তাঁহার সমকক্ষ? পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিও না, উমেশ।

বাধা পাইয়া উমেশ একেবারে মুষড়িয়া গেলেন। তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নন্দলালের দিকে চাহিলেন বটে, কিন্তু নন্দলালও ইহার উপর অধিক কথা কহিতে সাহসী হইলেন না।

নায়েব মহাশয় তাঁহার বাক্যসমাপ্তির পর ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনরপি কহিলেন, "সুধীরদের পারিবারিক অবস্থা যাহা বলিলে তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। হরিমোহন বাবু কি কিছুই রাখিয়া যান নাই?"

নন্দলাল। আজ্ঞে না। যাহা কিছু ছিল তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। এখন ঋণ ব্যতীত দিন চলা ভার। কিন্তু কর্জ্জও সহজে মিলিতেছে না।

নায়েব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু, আমার অবস্থা তত সচ্ছল নয় যে আমি হরিমোহনবাবুর পরিবারগণের কোনও উপকার করিতে পারি। আচ্ছা, সুধীর কি চেষ্টা করিয়াও কোন ভাল কাজ জুটাইতে পারিতেছে না?

নন্দলাল। ভাল কাজ? কোন কাজই জুটিতেছে না। শীঘ্র যে জুটিবে সে ভরসাও কম। তাই বলিতেছিলাম এমন গরীবের সহিত কমলের বিবাহ দিবার আবশ্যক কি?

দৃঢ়স্বরে কালীতারা কহিলেন, "গরীবের ঘরে কমলের বিবাহ কখনও হইতে দিব না। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে কি সকল মানসম্ভ্রম নষ্ট করিবে?

কথোপকথনের সুর বদলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া নন্দলাল মনে মনে বড় খুসী হইলেন। আশার সুসার হইবে ভাবিয়া তিনি কালীতারার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "বড় লোকের ঘরেই কন্যাদান করা উচিত। অগ্রে কৌলীন্যমর্য্যাদা দেখিতে হইবে। তার পর সাংসারিক অবস্থা। দুই ভাল হইলে তো সোণায় সোহাগা।"

অধৈর্য্যের সহিত কালীতারা কহিলেন, "না, না, আমার জীবন থাকিতে সুধীরের সহিত কমলের বিবাহ দেওয়া হইবে না। বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা করা চাই-ই।"

নায়েব মহাশয় এই প্রস্তাব এক্ষণে ক্ষান্ত করিবার জন্য কহিলেন, "বেশ, বেশ, এ সম্বন্ধে পরে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। রাত্রি অধিক হইল, আজিকার মত থাক্।"

এইপ্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে একজন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল। রোরুদ্যমানা, কমলিনী।

রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। রোগে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে আরামদায়িনী শান্তিবিধায়িনী নিদ্রাদেবীও সময় বুঝিয়া কমলিনীর প্রতি নিদয়া হইলেন।

ঐকান্তিক সাধনার অসাধ্য কার্য্য কি? দৈনন্দিন সেবায় কালীতারা নন্দলালের প্রতি সন্তুষ্টা হইলেন। ফলে কালীতারা কমলিনীর প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর বিরূপা হইয়া পদে পদে তাঁহার ত্রুটি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সপত্নীকন্যার প্রতি তিনি কোন কালেই তুষ্টা ছিলেন না। এখন হইতে প্রকাশ্যে বৈরিতা আরম্ভ করিলেন।

নায়েব মহাশয় চিরকাল সুধীরের বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা এবং চরিত্রগুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানিতেন, রূপে, গুণে উপযুক্ত এরূপ সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র জামাতা লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘোষজা সকল সময়ে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন না। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে পুনঃ পরিণীত ব্যক্তির চরিত্রে এই দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক। কালীতারার ভিতর এক অলৌকিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তদধিক পক্ষের কোন্ স্ত্রীর ভিতর সে শক্তি নাই? তবে কালীতারাতে এই অন্তর্নিহিত শক্তি সমধিক বিদ্যমান ছিল। উহার প্রবল আকর্ষণ এড়াইবার সামর্থ্য বৃদ্ধ গৌরবিনোদের ছিল না। একে ঘরে তরুণী ভার্য্যা, তদুপরি তাঁহার গৃহে সামান্য কারণে উল্কাপাতের আশঙ্কা অহরহ বর্ত্তমান। ঘোষজা কোন্ সাহসে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে অসন্তুষ্ট করিবেন?

নন্দলাল স্থির করিয়াছিলেন, স্বরূপপুর নিবাসী নির্ব্বোধ কুলীন সন্তান গঙ্গারাম মিত্রের সহিত কমলিনীর বিবাহ দিবেন। গঙ্গারামের বয়স উনবিংশ, আকৃতি মনোজ্ঞ। সে সরলচিত্ত ভীরুস্বভাব বালকমাত্র। অনেক অন্বেষণ করিয়া নন্দলাল এই রত্ন মনোনীত করেন। তিনি জানিতেন, মূর্খ ও বুদ্ধিহীন গঙ্গারাম তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির গূঢ় অভিলাষ মুকুলে বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

নন্দলাল ব্যূহরচনা করিয়া কার্য্য করিতে বিশেষ দক্ষ। তাহাতে আবার "সুগ্রীব সহায়"। উভয়ের উত্তেজনায় কালীতারা জিদ্ ধরিলেন, গঙ্গারামের সহিত কমলিনীর বিবাহ না দিলে তিনি গলায় দড়ি দিবেন।

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়ের ইহার উপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সাহস হইল না। কাজেই গঙ্গারামের সহিত কমলিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাকা দেখাও হইল।

কমলিনী ও সুধীরের অবস্থা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রবল হৃদ্গত আশা বিনষ্ট হইতে দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? কমলিনী দিবানিশি অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত করিতেছিলেন। বৃদ্ধ এ সকল দেখিয়াও দেখিলেন না। এক এক বার কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া বোধজ্ঞা কহিতেন, "দেখ

মা, নিয়তি কে খণ্ডন করিতে পারে? ঈশ্বরের ইচ্ছা, গঙ্গারামের সহিত তোমায় বিবাহ হয়। মন খারাপ করিয়া কোন ফল নাই। কেবল নিজে কষ্ট পাইতেছ। গঙ্গারাম অতি সৎপাত্র।"

লজ্জাশীলা বালিকা ইহার উত্তরে কি কহিবেন? তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। নিরাশার তীব্র যন্ত্রণার উপর কমলিনী বিমাতার বাক্যযন্ত্রণায় আরও কাতর হইলেন। যখন তখন কালীতারা বলিতেন, "হাঁ গো কমল, তোর রকম খানা কি? দিন রাত্তির কেঁদে কেঁদে যে পাগল করে তুল্লি? কেউ ম'লেও তো লোকে এমন করিয়া কাঁদে না। খুব ঢলাঢলিটা কল্লি যাহোক্।" আবার প্রায়ই কহিতেন, "মরণ আর কি, এমন ধারা বেয়াড়া অবুঝ মেয়ে তো আমি কোথাও দেখিনি। ওলো, স্বয়ম্বরা হ'বার সাধ হ'লেই কি কোন বাঙ্গালী হিঁদুর মেয়ে তা' হয়েচে? এখন ন্যাকাপণা রাখ্।" একবেলা আহার করিয়া কমলিনী ক্রমেই শীর্ণা হইতে লাগিলেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি মলিন হইল। কালীতারা পতিকে কহিলেন, "নিজে সাধিয়া অসুখ ডাকিয়া আনিলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? ডাক্তার দেখাও। একটু খানি কেষ্ট-রস (ক্যাষ্টর-অয়েল) দিলেই বোধ হয় সারিয়া যাইবে।"

ঔষধ দেওয়া হইল। কিন্তু কমলিনা তাহা গলাধঃকরণ করিলেন না। তিনি কহিলেন, "আমার কোন অসুখ হয় নাই। শুধু শুধু ঔষধ খাইয়া কি করিব?" কালীতারা গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বটে, পয়সা বুঝি ভেসে এসেছে? অষুদ কিনিতে টাকা লাগে না আর কি? তোকে অসুদ খেতেই হবে।" কমলিনী ঔষধও খাইলেন না, আহারও করিলেন না। সে দিন তিনি সম্পূর্ণ অনশনে রহিলেন। কালীতারা অত্যুচ্চ স্বরে পতির কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া কহিলেন, তোমার গুণের মেয়ে কোন অসুদ খাবে না। সে বল্লে, সুধীরের সহিত বিয়ে না দিলে অসুদও খাবে না, ভাতও মুখে দেবে না! মেয়ের আস্পর্দ্ধা দেখ। তার মায়ের নামে কি বিষয় আছে, সেই গরবেই কমল আমার সঙ্গে এমন করে।" কথা সমাপ্তির পরেই অশ্রুবর্ষণ হইল! বৃদ্ধ তখন নিজের কাপড় দিয়া তরুণীর আর্দ্রচক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিলেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্নেহ হ্রাসের কারণ। আর, বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তাঁহারাই ধীর। তাই, ঘোষজা কমলিনীর ক্রন্দন ও অনশনব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিলেন। তাঁহার ধারণা, প্রথম চোট্‌টা সামলাইয়া গেলে তিনি যাহাকে মনোনীত

করিবেন, বালিকা তাহাকেই ভাল বাসিতে বাধ্য হইবে। পরে সুধীরকেও ভুলিবে এবং আপনার ঘরসংসার বুঝিয়া লইবে।

বৃদ্ধের যৌবনকালীন স্মৃতি শৈবালে জড়িত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, হৃদয় হইতে এ দাগ মুছিবার নয়। তিনি জানিতেন না, গঙ্গারাম কেন, কোন 'রাম'কেই চেষ্টা বা জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা যায় না। প্রেম স্বতঃপ্রণোদিত।

দুঃখক্লিষ্টা কমলিনী কি করিবেন? তাঁহার বড় সাধ ছিল, সুধীর তাঁহারই হইবেন। সুধীরকুমারও কমলিনীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিয়া সুখী হইবার মানসচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের সকল ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়? বালিকা এক একবার ভাবিয়াছিলেন, আত্মহত্যা করিয়া দুঃখ জ্বালা শেষ করিবেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কাজেই তাঁহার মরা হইল না। পিতার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। হিন্দুর ঘরে বালিকার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

পাকা দেখার পর নায়েব মহাশয় একদিন সায়াহ্নে সুধীরকে ডাকিয়া কহিলেন, তিনি যেন আর নিভৃতে কমলিনীর সহিত সাক্ষাৎ না করেন। কেননা, সৎকুলীন গঙ্গারামের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পরিশেষে নায়েব মহাশয়

কিঞ্চিৎ মিষ্টস্বরে জানাইলেন, তিনি বরাবর সুধীরকে খুব ভালবাসেন, তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করে এক, ঈশ্বর করান আর এক। আমরা গড়ি, তিনি ভাঙ্গেন। আমরা করি সুখ-কল্পনা, তিনি করেন চক্ষুদান। সকল সময় মানুষ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম। নায়েব গৌরবিনোদ ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া আপনার দুর্বলতার সাফাই যেরূপে দিয়াছিলেন, পৃথিবীতে অনেকেই সেরূপ করিয়া থাকে। আমরা যে প্রায়শঃ আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে পারি না, তাহা কেবল আমাদের ইচ্ছার তীব্রতার অভাবে।

সুধীর নতশিরে ঘোষজার সকল কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান কম ছিল না। তিনি একবার ভাবিলেন, নায়েব মহাশয়ের অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিবেন; পরিশেষে, উহা প্রতিবাদের অযোগ্য জ্ঞান করিয়া নীরব রহিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "শুনিয়াছি, কমলিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ও না খাইয়া শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এমন হইলে তাহার কঠিন পীড়া হইবে। আপনি অনুমতি করিলে আমি একবার তাহার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা দিতে পারি।"

বৃদ্ধ ভাবিলেন, ভাল রে বাপু! মেয়েটাকে আরও বুঝি

চক্ষুর জলে ভাসাইবে? আর ইন্ধনে কাজ নাই। তুমি আর অনুগ্রহ করিয়া কমলের উপকার না করিলেই সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে ধীরে ধীরে গঙ্গারামের প্রতি অনুরক্তা হইবে। এ সব হা হুতাশ কয় দিন থাকে? মনে নূতন একটা আঘাত লাগিয়াছে। তাই কমল এতটা বাড়াবাড়ি করিতেছে। সময়ে সব সহিয়া যাইবে। তুমি এখন আপনার পথ দেখ, বাপু!

পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "কমল দুয়ারে খিল্ দিয়া রাগ করিয়া শুইয়া আছে। আজ আর তাহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। আর এক দিন বরং দেখা করিও।"

বিষণ্নমনে সুধীর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার অধ্যয়ন-কক্ষে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুতে মন সুস্থির করিতে না পারিয়া তিনি বাটীর বাহিরে গেলেন, তৎপর গৌরীতটে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ও মনে মনে কহিলেন, "হায়, কমলিনি! তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কি এতই অগভীর ও স্বার্থপর, আমি কি এতই নীচ যে নিভৃতে প্রেমালাপ করিয়া তোমার ভবিষ্যৎ সুখের কণ্টক হইব? ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম। আমার সকল সুখের এই শেষ, কমলিনি! আজ আমার সকল আশার সমাধি। তোমাতে আমাতে মিলনের জন্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম বর্দ্ধনের নিমিত্ত,

তোমার পিতা কোন্ সুযোগ সুবিধা না করিয়া দিয়াছিলেন? আর, আজ? তোমার চিন্তাম্লান মুখখানি দেখিয়া যে তোমাকে সান্ত্বনা দিব সে সুখেও আমি বঞ্চিত। হা অদৃষ্ট! একটি বার, শুধু একটিবার যদি তোমার সেই মুখখানি দেখিতে পাইতাম!"

যোগজা বিশেষ সত্যপ্রিয় ছিলেন, এরূপ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তাহার কারণ অনেক। তবে বর্ত্তমান কারণও তুচ্ছ নহে। তিনি যখন সুধীরকে বলিয়াছিলেন, কমলিনী দুয়ারে খিল্ দিয়া রাগ করিয়া শুইয়া আছে, তখন কমলিনী পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সুধীরের সহিত পিতার কথোপকথন শুনিতেছিলেন। পিতার রূঢ় বাক্যে বালিকা বড়ই মনোব্যথা পাইয়াছিলেন। সুধীরের অবস্থা ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। কমলিনী ব্যতীত সুধীরের মর্ম্মবেদনা কে আর বুঝিবে?

সুধীর চলিয়া গেলে বালিকা বৃদ্ধ যদুসিংকে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন, "যাদো দা, তুমি সকলই দেখিতেছ, শুনিতেছ। তোমার কাছে লুকাইবার কিছু নাই। সুধীর বাবুকে গিয়া বল, দিদিমণি আপনাকে কাল সন্ধ্যার সময় একবার আসিতে বলিয়াছেন। শুন যাদো দা, তুমি ছাড়া এ সংসারে 'আপনার' বলিবার আমার আর কেহ নাই। তুমি

যদি দয়া করিয়া তাঁহাকে একবার খবর দাও তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হয়।”

‘এত করিয়া বলিতে হইবে না’ বলিয়া যদুসিং প্রস্থান করিল।

সুধীর যখন গৌরীতটে পাদচারণ করিতেছিলেন, তখন এক দৃঢ়কায় ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। আগন্তুক, যদুসিং। সে যুবাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “বাবুজি, দিদিমণি কহিয়াছেন আপনি কাল সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।

সুধীরের মন চিন্তাক্লিষ্ট। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, “আচ্ছা”। যদুসিং চলিয়া গেল; সুধীরও রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া বাটী আসিলেন। নানারূপ ভাবনায় রজনী শেষ হইল। পরদিনও অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া সুধীর কমলিনীর আহ্বানের কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে তিনি নায়েব মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঘোষজা তখন বাটী ছিলেন না।

সুধীর অন্তর্বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় নন্দলাল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “সুধীরবাবু, এখানে আপনার কি দরকার?”

নন্দলালের কথার শ্লেষ অনুভব করিয়া সুধীর কহিলেন, “বাটীর ভিতরে প্রয়োজন আছে।”

নন্দলাল। খবর দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলে কি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কার্য্য হইত ?

সুধীর। এতকাল এত্তেলা না দিয়াই যাতায়াত করিয়াছি। এখনও আপনার আমল হয় নাই। এত শীঘ্র যে নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা জানা ছিল না।

নন্দলাল। ব্যঙ্গের কোন আবশ্যক করে না। স্মরণ করিয়া দেখুন, কাল জ্যেঠা মহাশয় আপনাকে কমলিনীর সহিত দেখা করিতে অনুমতি দেন নাই। এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, আপনাকে আর তপোবনে হরিণশিশু শিকার করিতে দেওয়া হইবে না। জানিবেন, আপনার ইচ্ছা প্রতিহত করিবার শক্তি আমার আছে।

সুধীর। নন্দ বাবু, সংযতভাবে কথা কহিবেন। অন্যত্র হইলে আপনার অশিষ্টাচরণের প্রতিফল পাইতেন।

ক্রুদ্ধ নন্দলাল চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি, যত বড় মুখ তত বড় কথা?—গিরিধারী সিং, নেকালো সুধীর বাবুকো।" 'সামাল' বলিয়া যদুসিং গিরিধারীকে নিবৃত্ত করিল। গোলযোগ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কমলিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন রোষে ক্ষোভে ও ঘৃণায় সুধীরকুমার, "ইহার প্রতিফল একদিন পাইতে হইবে" বলিয়া, ঘোষজার বাটী ত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে

যাইতেছিলেন। নন্দলালের কাণ্ডে বালিকা স্তম্ভিতা হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূপতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। একটি ইষ্টকখণ্ডে আঘাত লাগিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া গেল ও দরদর-বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। বালিকার ব্যবহারে নন্দলাল অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ভর্ৎসনা করিবার অবসর কোথায়? যত্নসিং ক্ষিপ্রগতি জল লইয়া আসিল। সকলেই কমলিনীর চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টা করিলেন। একজন দরওয়ান ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে দৌড়াইল। ডাক্তারবাবু আসিয়া 'ব্যাণ্ডেজ্' বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, "শক্ত আঘাত লাগিয়াছে। কাল না গেলে কিছু বলা যায় না। সম্পূর্ণ বিশ্রামই হইতেছে ইহার এখন ঔষধ।" নায়েব মহাশয়কেও একজন ডাকিতে গিয়াছিল। তিনি কিছু পরে আসিলেন।

সমস্ত রাত্রি বালিকার সংজ্ঞা ছিল না। পরদিবস প্রাতে মধ্যে মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার হইত, আবার শীঘ্রই চৈতন্যলোপ হইত। এইভাবে সেদিন কাটিয়া গেল। ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আর জীবনের আশঙ্কা নাই।"

কমলিনী চৈতন্যলাভ করিয়া ভাবিলেন, "আমি কেন মরিলাম না? কত লোক মরিয়া বাঁচে। আমার পক্ষে মরণই সুখের কারণ। এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না। হে ভগবান,

তুমি এই মাতৃহীনা দুঃখিনী বালিকাকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। মৃত্যু তো অনন্ত বিশ্রাম। আমায় সেই বিশ্রাম দাও, সেই মহানিদ্রায় অচিরে আমার সকল দুঃখজ্বালার অবসান হউক। হে দুঃখবিনাশন, অনাথনাথ! জীবন তোমার দান। তাহা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু তুমি দয়ার সাগর। দয়া করিয়া এই হতভাগিনীকে সংসারের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে তোমার চিরসুশীতল ছায়াপূর্ণ দিব্যলোকে লইয়া যাও। হায় সুধীর, আমার চিরবাঞ্ছিত সুধীর, আমার জন্য তোমার এই অপমান, আমার জন্য তোমাকে এত মনস্তাপ সহ্য করিতে হইল! হায়, এ নিষ্ফল জীবন গেল না কেন?"

কমলিনী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখন আর পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লমুখী নহেন। চিরহাস্যময়ী কমলিনী শুষ্ক বততীর ন্যায় ম্লান হইয়াছেন, তিনি এখন প্রাণহীনা, প্রস্তরময়ী!

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—⊶⊷—
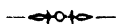
## সুধীরের পূর্ব্ব-পরিচয়।

সুধীরকুমারের পিতা হরিমোহন রায় প্রায় কুড়ি বৎসর হইল মোহনপুরে বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শালিখা নামক বিস্তৃত পরগণার বিখ্যাত ভূস্বামী ছিলেন। হরিমোহন শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। বংশপরম্পরায় যেমন অনেক জমিদারি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, তেমনি শালিখা পরগণা ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান অংশ, হরিমোহনের জ্যেষ্ঠতাত মৃত্যুঞ্জয় রায়ের। হরিমোহনের পিতা জীবদ্দশায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া ছলে বলে কৌশলে অনেককে হস্তগত করিয়া প্রচার করেন, হরিমোহনের পিতা বিষয়সম্পত্তি কিছু রাখিয়া যান নাই, যাহা কিছু তাঁহার শেষাবস্থায় অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই, শালিখায় আর তাঁহার তিলার্দ্ধ ভূমি নাই। তখন হরিমোহনের মাতুল জয়রামপুরে

কেরাণীগিরি করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর হরিমোহন তাঁহারই নিকট লালিত পালিত হয়েন। শৈশবেই তাঁহার যথেষ্ট উদারতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অতঃপর নানা স্থানে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া, পরের বাটীতে রন্ধন করিয়া, উদরান্নসংস্থানকরতঃ আত্মনির্ভরশীল হরিমোহন তদানীন্তন বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তৎপর ওকালতি পাশ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং উৎসাহ, অধ্যবসায় ও ধীশক্তিবলে অচিরে বিশেষ প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করেন। বাল্যে অর্থাভাবে ইংরেজি শিখিতে না পারায় তাঁহার বরাবর মনঃকষ্ট ছিল। কিন্তু পরিশেষে অধ্যবসায়বলে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, পারস্য, উর্দ্দু ও ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উপনিষৎ হউক, দর্শন হউক, ধর্ম্মশাস্ত্র বা জাতীয় ইতিহাস হউক, কোন না কোন গ্রন্থ তাঁহাকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করিতে দেখা যাইত। তিনি সত্যপ্রিয়, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরহিতরত ছিলেন। কেহ তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও পরনিন্দা করিতে শুনে নাই কিম্বা কখনও মিথ্যা মকদ্দমা গ্রহণ করিতে দেখে নাই। তাঁহার বাসা একটি আশ্রমের ন্যায় ছিল। উহা নিঃসহায় দরিদ্র উমেদার ও স্কুলের ছাত্র এবং অতিথি অভ্যাগতের কলরবে সর্ব্বদা মুখরিত হইত। এইরূপে হরিমোহন সসম্মানে ওকালতি ও নিরাশ্রয় প্রতিপালন করিয়া

একদা আদালতে সওয়ালজব করিতে করিতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

হরিমোহনের বিয়োগের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরকুমারের উপর সংসারের সকল ভার পতিত হয়। প্রতিপাল্য অনেকে। তন্মধ্যে অনাত্মীয় ও দূরসম্পর্কিত আশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষাদে ও কৃতজ্ঞতায় বাষ্পাকুললোচনে একে একে অন্যত্র গমন করিলেন। সুধীরের বিধবা মাতা, অবিবাহিতা ভগ্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী ও দুই চারি জন আত্মীয় মোহনপুরের প্রাসাদোপম বাটীতে রহিলেন। পিতৃবিয়োগের পর সুধীরকুমার দেখিলেন, তাঁহার আশ্রিতপালক ও দানবীর পিতা সকল অর্থ পরসেবা ও পরপ্রতিপালনে অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, পরের ঋণ পরিশোধে আপনার বিপুল বিষয় পর্য্যন্ত দায়গ্রস্ত করিয়াছেন। যে জোতগুলি ছিল, তাহা দ্বারা বার মাস পরিবার পরিজন প্রতিপালন হওয়া দুর্ঘট।

সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া সুধীরকুমার ভাবে গদ্গদ কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আশ্বাস্য পর্ব্বতকুলং তপনোপতপ্ত-
মুদ্দামদাববিধুরাণি চ কাননানি।
নানানদীনদশতানি চ পূরয়িত্বা
রিক্তোঽসি যজ্জলদ সৈব তবোত্তমশ্রীঃ॥"

অর্থাৎ,—হে মেঘ! তুমি সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত পর্ব্বতকুল ও উদ্দামবনাগ্নিদগ্ধ কাননকে সুশীতল এবং নানা নদনদীকে পরিপূরিত করিয়া যে রিক্ত হইয়াছ উহাই তোমার অপূর্ব্ব শোভা।

বলা বাহুল্য, এই পুরুষপুঙ্গবের দেহান্তরের অব্যবহিত পরেই তাঁহার অন্নে পুষ্ট, নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত, নানাপ্রকারে উপকৃত 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বান্ধবগণ তাঁহার অকলঙ্ক যশোরাশিতে কালিমা লেপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃত্রিম আক্ষেপের সহিত কহিতে লাগিলেন, "হায়, এমন বিচক্ষণ ধনশালী ব্যক্তি অবিবেচকের ন্যায় সকল অর্থ কতিপয় হতভাগা বালক ও উমেদারদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য নবাবের ন্যায় ব্যয় করিয়া গেল! এখন সে নিজে তো মরেই খালাস, সংসারটা যে একেবারে ডুবিল। বলি, তুমি তো বাপু, দিন কতকের জন্য খুব "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ক'রে গেলে, এখন তোমার গোষ্ঠিকে খাওয়ায় কে? দুই দুইটা ছেলের লেখা পড়া শেখা, তার উপর মেয়ের বিয়ে আছে। এক পাল পরিবার পরিজন রহিয়াছে, তা'দের অন্নবস্ত্রের কোন সংস্থান নাই! কেবল হাউইএর মত উঠিলেই হয় না। উত্থানও যেমন দ্রুত, পতনও তেমনই দ্রুত হইয়াছে।"

পাঠক, এই সমালোচনার কারণ অনুসন্ধান করিবেন কি? নিঃস্বার্থভাবে পরনিন্দা করা মনুষ্যের স্বভাব। হরিমোহ-

যাহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন, তাহারাই এক্ষণে তাঁহার অপভাষণে বিশেষ উৎসাহী। এই পৃথিবীতে সচরাচর যাহার ভাল করা যায়, সেই উপকারীর নিন্দাতৎপর প্রবল শত্রু। হউক,—কিন্তু, তাই বলিয়া কি মহৎব্যক্তির গৌরবের হ্রাস হয়? উহাতে কেবল পরাপবাদকীর্ত্তনতৃপ্ত লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে কি মণির মূল্য হ্রাস হয়? এ জগতে কে নির্ব্বৈর? কে সকলের প্রিয়, সকলের দ্বারা স্তুত? পরগৌরবস্পর্দ্ধী অক্ষম ব্যক্তিগণ কবে কুৎসাপ্রচার দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে বিরত হইয়া থাকে?

পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর দুঃখে কষ্টে কাটিয়া গেল। কমলিনীকে পাইবার আশা—হায়, সে আশাদীপও নির্ব্বাপিত হইল!

---

খাট হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি অন্য-মনে হাঁটিতেছেন। কিন্তু পা আর চলে না। পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকার দ্বারদেশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তিনি প্রায় সংজ্ঞাশূন্য।

ইহার কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শুনিতে পাইলেন, বাহিরের দরজায় এক দিব্যকান্তি যুবক অনশনে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। শুনিয়া, তিনি সুধীরকে তাঁহার বাটীর অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথোচিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিলেন। যুবকের চৈতন্যসঞ্চার হইল। তৎপরে সুস্বাদু সরবৎ পান করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলে, তাঁহাকে রৌপ্য ও মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রে নানাবিধ আহার্য্য প্রদত্ত হইল। তিনি আসনে বসিলেন বটে, কিন্তু আহার করা হইল না; তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলে যুবক কহিলেন, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আজ আমাকে অনশনজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আহার-সামগ্রী আমি কিরূপে মুখে দিব? আমার মা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন আজ হয়ত অর্দ্ধাশনে রহিয়াছেন। আমার সম্মুখে এত প্রচুর ও দুর্লভ খাদ্য, আর তাঁহারা হয়ত সামান্য শাকান্নের জন্য কষ্ট পাইতেছেন! আমাকে শুধু এক মুঠা

ভাত দিন্; আর কিছু আমি চাহি না।” বৃদ্ধ গৃহস্বামী সুধীরের অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নানা সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। উপরোধের আতিশয্যে সুধীরকে আহার করিতে হইল। তিন দিন অনশনের পর অন্ন কি রুচিপ্রদ, কি উপাদেয়, কি তৃপ্তিদায়ক! কুতূহলাক্রান্তা প্রতিবেশিনীগণ যুবকের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কার্ত্তিকেয়োপম সুধীরের প্রশংসা-বাদ করিতে করিতে স্বভবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আহার সমাপনান্তে গৃহস্বামী সুধীরকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন ও তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে কহিলেন, “দেখুন, সুধীর বাবু, এখানে একটি বেসরকারী স্কুল আছে। আমি তাহার সেক্রেটারি। ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ এখন খালি আছে। মাসিক বেতন ৪০৲ চল্লিশ টাকা। আপাততঃ এই কার্য্য গ্রহণ করুন। আর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার দুই পৌত্রকে পড়াইলে, মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতন পাইবেন।” কৃতজ্ঞতায় সুধীরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। আশ্রয়দাতাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া যুবক ভগবানকে স্মরণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, “এখন আর আমার দুঃখ কি? মাসিক ৬৫৲

পঁয়ষট্টি টাকায় যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। আমার নিজ খরচের জন্য ১৫৲ পনর টাকার অতিরিক্ত কিছুতেই লাগিবে না। দেশে কিছু জোত আছে। তাহার উপর ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিলে, পল্লীগ্রামে সংসারখরচ বেশ চলিয়া যাইবে। দীনবন্ধুর অপার দয়া। তিনিই নিরন্নের অন্নদাতা, আর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা, ধনীনির্ধনের একমাত্র আশ্রয়, সম্পদে বিপদে চির-সহায়। জয় সর্ব্বশক্তিমান্, জয় ভগবান্!"

সুধীরকুমার স্কুল-বোর্ডিংএ থাকিয়া দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর হুগলীর স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তিনি সুধীরের অধ্যাপনা-প্রণালী দৃষ্টে অতীব প্রীত হইয়া, তাঁহাকে মাসিক ১০০৲ এক শত টাকা বেতনে জনৈক রাজকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুধীর তখন হুগলী কলেজে বি, এল্, পড়িতেছিলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতার পরামর্শক্রমে উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিলেন না। যখন সুসময় হয়, তখন সুবিধার উপর সুবিধা অযাচিতভাবে আসে।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### অদৃষ্ট-চক্র।

কমলিনী সুস্থা হইলে নায়েব মহাশয় কার্য্যব্যপদেশে সদরে চলিয়া গেলেন। শুনা যায়, তিনি জমিদারের নিকট হইতে এক জরুরি তার পাইয়াছিলেন।

সদরে উপস্থিত হইলে জমিদার নায়েব গৌরবিনোদকে কহিলেন, "রসুলপুর পরগণা বিদ্রোহী হইয়াছে। আমার অপর কোন কর্ম্মচারী আপনার ন্যায় মহাল শাসনে দক্ষ নহেন। তাই রসুলপুরে আপনাকে পাঠান স্থির করিয়াছি। জানিবেন, আপনার সকল উন্নতি ইহার উপর নির্ভর করিতেছে।" নায়েব মহাশয়ের পক্ষে এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। কেননা, তিনি জানিতেন, তদানীন্তন দেওয়ান জমিদারের বিশেষ প্রিয় ছিলেন না এবং ভবিষ্যতে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার তাঁহারই সম্পূর্ণ ভরসা। এক্ষণে সেই আশা পূর্ণ করিবার ভগবদ্দত্ত অবসর উপস্থিত।

ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহী প্রজাগণের ঘর জ্বালাইয়া, হাতী দিয়া

াধুদি শা শস্যাদি নষ্ট করিয়া, মিথ্যা মকদ্দমায় তাহাদিগকে
রোপক্ষি ৎপীড়িত করিয়া, নায়েব মহাশয় অনেকবার অনেক
হাল সন করিয়াছিলেন। এবারেও উক্ত উপায়ে শান্তি
ংস্থাপন করিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু এবারকার অবস্থা
ানিয়া তাঁহার চক্ষুঃস্থির হইল! তিনি শুনিলেন, প্রজারা
াছারিবাটী লুঠ করিয়া ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে ও তত্রত্য
ায়েবকে মারপিট করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছে।
রকন্দাজেরা প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। দুইজন ভোজপুরীর
ুণ্ডহীন কবন্ধ কাছারির সম্মুখস্থিত বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিয়াছে।
ানীয় পুলিশ ইহার কোনও তদন্ত করে নাই। শুনা যায়,
ামবাসিগণ ঐ লাস দুইটি পরে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। পুলিশ
াদরে জানাইল, দরওয়ানেরা কাছারিবাটী লুঠ করিয়াছে ও
ৃহদাহ করিয়া পলাইয়াছে।

অতঃপর ঘোষজা আমীর-খাঁর নেতৃত্বে এক শত দুর্দান্ত
াঠিয়াল সঙ্গে লইয়া রসুলপুর যাত্রা করিলেন। এই মহাল
াসনে আমীর খাঁর সহায়তা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক চি
ায়েব মহাশয় তাহা ভালরূপে জানিতেন। ত
র্দারকে ডাকাইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে উত্তে
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমী
কথোপকথন হয়, তাহার সারাংশ নিম্নে

ধীরগম্ভীরস্বরে নায়েব মহাশয় সর্দ্দার লাঠিয়ালকে
করিয়া কহিতেছিলেন, "শুন আমীরখাঁ, এই মহাল
উপর আমার ভবিষ্যৎ সকল আশাভরসা, যশঃ ও উন্ন . .নর্ভ
করিতেছে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান দেওয়ানে
প্রতি জমিদার সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষ
জানাইয়াছেন, বিদ্রোহীশাসনে সক্ষম হইলে আমাকে
দেওয়ানিপদ দিবেন। আমার দেওয়ানিপদপ্রাপ্তি ও তোমা
অবস্থোন্নতি একই কথা। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, রসুলপু
পরগণার প্রজাগণকে মেষের ন্যায় শান্ত করিতে পারিলে তথ
কার শ্রেষ্ঠ জোত তোমাকে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া কো
বিশেষ মূল্যবান্ পুরস্কারও তোমার ভাগ্যপরিবর্ত্তনে যথে
সহায়তা করিবে। বিদ্রোহীদিগের নেতা বৃদ্ধ উজীর হোসেনে
সহিত তোমার পিতার বহুকালের বিবাদ। তাহার শত্রুত
চরণে তোমার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার
চক্রান্তে আজ তোমার এই দশা। . নহিলে স্বনামখ্যাত বাচ্চ
ক কে না চিনিত, কে না জানিত? তাহার বিষয়সম্পত্তি
গৌরবের কথা কাহার অবিদিত? কিন্তু সে পূর্ব্বসম্মানে
অবশিষ্ট আছে? নাই,—কিছুই নাই। আমী
ন্যায় পুত্র আমীরখাঁ আজ পথের কাঙ্গাল
ক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত হইতে পার কি

ধুদি শা কাহার অত্যাচারের ফল? ভাবিতে বিস্ময় হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, প্রতিহিংসায় মন উত্তেজিত হয়! যদি তোমার শিরায় এখনও রক্তপ্রবাহ ছুটে, যদি তোমার বাহুতে দুষ্কৃতের শাস্তিবিধান করিবার শক্তির কণিকামাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি তুমি সিংহের পুত্র শৃগাল না হও, তবে তুমি কখনও উজীরের পাপের প্রতিফল দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।”

রোষকষায়িতলোচনে গম্ভীরস্বরে সর্দ্দার কহিল, “আমীর খাঁ শত্রুকে উচিত শাস্তি দিতে কখনও ভুলে না।”

নায়েব মহাশয় সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দুর্দ্দান্ত লাঠিয়ালকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য কহিতে লাগিলেন, “আমিও ভাবিয়াছিলাম, বাচ্চা খাঁর পুত্র শত্রুকে ক্ষমা করিতে অশক্ত। ক্ষমারও সীমা আছে। শুন, আমীর খাঁ, উজীরের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। আজ প্রতিহিংসা লইবার শ্রেষ্ঠ অবসর উপস্থিত। আপনা-আপনি আগত মহাসুযোগ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছাড়িয়া থাকে? উজীর বিদ্রোহী, জমিদার তোমার অনুকূল। তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া আপনার হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত কর। সমস্ত পরগণা এমন সায়েস্তা করিতে হইবে, রসুলপুরে এমন আতঙ্ক জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে আর কেহ এ প্রদেশে যেন মাথা তুলিতে সাহস না করে। একশত বিশ্বস্ত লাঠিয়াল তোমার অধীন হইয়া তোমার আদেশে

সকল কার্য্য করিবে। আজ হইতে সাত দিন মধ্যে যেন তোমার দক্ষতার পরিচয় পাই।”

অধীরভাবে আমীরখাঁ কহিল, “নায়েব বাবু, কেবল এক দিন মাত্র সময় চাই। উজীর ও তাহার দলের প্রধানদিগের দর্প চূর্ণ করিতে ইহার অধিক সময় আবশ্যক করে না।”

নায়েব গৌরবিনোদ তখন বুঝিতে পারেন নাই, আমীর তাঁহার উত্তেজনায় কোন্ উপায়ে প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিতেছিল।

স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া সর্দ্দার তাহার কার্য্যোদ্ধারের সকল প্রণালী স্থির করিল। নায়েব মহাশয় তখন অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় মনে মনে ভবিষ্যতের সুখময় চিত্র অঙ্কন করিতেছিলেন।

পরদিন আকাশে খুব মেঘাড়ম্বর হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বারিপাত হইতে লাগিল। রাস্তায় জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। গৃহের বাহির হয় এমন সাধ্য কাহার? নায়েব মহাশয় দৈবদুর্যোগের জন্য সেদিন কার্য্যনাশ আশঙ্কা করিয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক দরবেশ জনৈক শিষ্য সহ বৃদ্ধ উজীরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উজীর হোসেনের সহস্র দোষ থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি

ধুদিগের প্রতি আস্থাবান্, অতিথিবৎসল ও বিনীত। ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্যে তিনি গ্রামপ্রধান। উজীর যথোচিত সমাদরে অতিথিদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিয়া চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয়াদি দানে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং রাত্রিযাপনের জন্য যথা-বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নানারূপ ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটিয়া গেল। রজনী দ্বিপ্রহরের পর সকলে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

দরবেশের সহিত উজীর হোসেনের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায়, আগন্তুক ধর্ম্মপরায়ণ বহুদর্শী পর্য্যটক। পল্লীগ্রামে এরূপ লোকের সহিত সাক্ষাৎকার দুর্লভ।

এদিকে উক্ত দিবসে আমীর খাঁ লাঠিয়ালদিগকে পাঁচ দলে বিভক্ত করিয়া, চারিদলকে চারিজন প্রধান বিদ্রোহীদিগের বাটীতে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং অপর দলকে উজীরের বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিল। তন্মধ্যে একজন তাহার নিকটে রহিল। অবশিষ্ট লাঠিয়ালেরা বাটী ঘেরাও করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। আর আর বাটীতেও লাঠিয়ালগণ চতুর্দ্দিকে লুক্কায়িত রহিল। রাত্রিশেষে সপরিবারে গৃহস্বামীদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করা উক্ত পাঁচ দলের উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণপক্ষ রজনী। সমস্ত রাত্রি বিদ্যুৎ-স্ফূরণ, মেঘগর্জ্জন ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। নিশার অন্ধকারে বিজলীর

হাসি বড়ই বিকট দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ বারি-পতন ক্ষান্ত হইলে শৃগাল ও পেচকের রব, গৃহপালিত কুক্কুটের ধ্বনি, পক্ষীর পক্ষান্দোলন শব্দ এবং কুকুরের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল। রাত্রিশেষে প্রকৃতির ভীষণতা আরও ভীষণতর হইল, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, বিদ্যুৎপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর জলদমন্দ্রে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইল এবং দুই এক স্থানে অশনিপাতের শব্দ শুনা গেল।

এমন সময়ে দরবেশ অনুচরকে কহিলেন, "জাফর, রাত্রি প্রায় শেষ হইল। আইস, প্রস্তুত হও।"

বলিতে হইবে কি, দরবেশ ছদ্মবেশী সর্দ্দার আমীর খাঁ?

আমীর ও তদনুচর ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ভোজালি ও লাঠি লইয়া প্রস্তুত হইল। লুক্কায়িত সঙ্গীদিগকে ইঙ্গিত করিবা-মাত্র তাহারা বাটীর চতুষ্পার্শ্বে লাঠিহস্তে দাঁড়াইল। আমীর ও জাফর বৃদ্ধ উজীরের শয়ন-কক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া, সহসা প্রবুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। উজীর হোসেন তখন পত্নীর সহিত নিদ্রামগ্ন ছিলেন। আক্রমণ-কারিগণ তাঁহাকে শয্যা হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া ভূপাতিত করিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে বৃদ্ধের বাক্‌রোধ হইয়াছিল। তখন আমীর তাঁহার বক্ষের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, শাণিত

ভোজালি বাহির করিল। গৃহকর্ত্রী এতক্ষণ প্রায় হতচেতনার ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভোজালি দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া আততায়ীর পদতলে পতিত হইয়া নানা প্রকার অনুনয় করিয়া পতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। পরে উত্তেজিত স্বরে গুণবতী মহিলা হত্যাকারীকে কহিলেন, "আমীর, তুমি আমার স্বামীর জীবন-নাশ করিতে আসিয়াছ? পথের ভিখারী হইয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলে, তখন কে তোমাকে অন্নদান করিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল? তোমার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে বলিয়া, কে তোমাকে সঙ্গোপনে সাহায্য করিয়াছিল? এ সকল কথা এতদিন বলি নাই; কিন্তু আজ বড় কষ্টে বলিতে হইতেছে, আমার কৃতকার্য্যের বুঝি ইহাই প্রতিফল!"

আমীর রূক্ষস্বরে কহিল, "বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছেন। শত উপরোধেও আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না। যদি জানিতাম, আমি নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুপত্নীর অন্নে পুষ্ট হইয়াছি, তাহা হইলে গোপনে প্রদত্ত ঐ দান ঘৃণার সহিত প্রত্যর্পণ করিতাম। আপনার কথায় আমার প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হইতেছে।"

গৃহকর্ত্রী আমীরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরস্বরে

কহিলেন, "রক্ষা কর, আমীর, রক্ষা কর! আমার যথা সর্ব্বস্ব লও, তবু আমার স্বামীর জীবন দান কর। এই চাবি দিলাম, সিন্দুক হইতে টাকাকড়ি মোহর অলঙ্কার যাহা কিছু আছে সকলই বাহির করিয়া লও। ইহা ছাড়া আমার বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে, সব তোমাকে লিখিয়া দিতেছি। যদি তোমাদের প্রতি আমার স্বামী কোন অন্যায় করিয়া থাকেন তবে উহাই দণ্ডস্বরূপ তোমাকে দিলাম। তবু, আমীর, একটি জীবন দান কর। আমি চিরকাল তোমার বাঁদী থাকিব।"

আমীর ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "আমি পিতার শত্রুর নিকট হইতে কপর্দ্দক লইতে ঘৃণা করি। পা ছাড়িয়া দিন্। জানিবেন, আজ উজীরের রক্ত ব্যতীত আমার আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না।"

এই বলিয়া আমীর বৃদ্ধের গলদেশে ভোজালি বিদ্ধ করিল। বৃদ্ধ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিয়া, মহীয়সী মহিলা তখন আমীরের হস্ত হইতে ভোজালি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। "হায় কি হইল, কে আছ রক্ষা কর" শব্দ মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে মিলাইয়া গেল। এই নিদারুণ কাতরোক্তি কেহ শুনিল না, এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তখন একটি মনুষ্যও সমাগত হইল না।

"জঞ্জাল দূর কর" বলিয়া, আমীর তাহার সঙ্গীকে আদেশ

করিল। পশুপ্রকৃতি লাঠিয়ালের দারুণ আঘাতে উজীরের সহধর্ম্মিণী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমীর বৃদ্ধের গলদেশে পুনরায় ছুরিকা বিদ্ধ করিতে করিতে কহিল, "কি আনন্দ, কি সুখ, আজ শত্রুবিনাশে সমর্থ হইয়াছি!" উজীর তখন বিগতপ্রাণ।

অতঃপর আততায়ীগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মৃতদেহ দুইটিকে এক নির্জ্জন স্থানে প্রোথিত করিল।

অপর লাঠিয়ালেরা অন্যান্য বিদ্রোহীদিগের বাটীতে রাত্রি-শেষে যুগপৎ আক্রমণ করে। তাহার ফলে, অনেকে বিষম প্রহৃত হয় ও গৃহস্বামীদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়।

পরদিন প্রত্যূষে আমীরের প্রমুখাৎ নায়েব মহাশয় সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল কহিলেন, "আমীর, কি করিলে?" লাঠিয়ালগণ অতি সত্বরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ছদ্মবেশী আমীরও কালবিলম্ব না করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

আজ আকাশ সম্পূর্ণ মেঘনির্ম্মুক্ত ও সুনীল হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ পূর্ব্বোক্ত লোমহর্ষণ ঘটনা যথাসময়ে অবগত হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। উজীর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিশ সদরে

রিপোর্ট করিল,—নায়েব গৌরবিনোদ ঘোষের হুকুমে কতিপয় দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল উজীরহোসেন ও তাঁহার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু লোক জখম হইয়াছে ও গ্রামের প্রধানদিগের বাটী চড়াও করিয়া আক্রমণকারিগণ টাকাকড়ি ও দ্রব্যাদি লুঠ করিয়াছে।

রসুলপুর থানার পুলিশ আততায়ীগণকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তবু লাঠিয়ালগণের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া গেল না। পুলিশ পথিমধ্যে নায়েব মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া, অপর দশজনকে সন্দেহক্রমে ধরিয়া আনিল। ধৃত-ব্যক্তিগণের হস্ত পৃষ্ঠদেশে রজ্জুবদ্ধ ছিল।

রসুলপুরের নূতন দারোগা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও কঠোরপ্রকৃতি। ভূতপূর্ব্ব দারোগার প্রতি সন্দেহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করিয়াছেন। কাছারিবাটী দাহের ও তথাকার নায়েবের বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনার তদন্তের জন্য বর্ত্তমান দারোগা রসুলপুরে প্রেরিত হইয়াছেন। শুনা যায়, ঘটনা-বিশেষে নায়েব গৌরবিনোদের উপর তাঁহার পূর্ব্বাবধি আক্রোশ ছিল।

নায়েব মহাশয় যখন পূর্ব্বোক্ত দশজনের সহিত থানায় আনীত হইলেন, তখন ভ্রূ কুঞ্চিত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, দারোগা লোহিতলোচনে কর্কশস্বরে কহিলেন, "হারামজাদারা,

এখন সকল অপরাধ শীঘ্র স্বীকার কর্। নহিলে, আমার হস্ত হইতে তোদের নিষ্কৃতি নাই।" নিরপরাধ ব্যক্তিগণ কেন অপরাধ স্বীকার করিবেন ? নায়েব মহাশয়ও কহিলেন, "এই হত্যাব্যাপারের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট নহি।"

"আচ্ছা, তবে কর্ম্মফল ভোগ কর্" বলিয়া দারোগা তাঁহাদিগের পিঠে বাঁশ ডলিয়া, নখে সূচ বিঁধাইয়া ও বেটন প্রহারে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। কতিপয় অনুচর প্রভুর কার্য্যে যোগ দিল। উৎপীড়নে কাতর ধৃতব্যক্তিগণ "বাপ্" "বাপ্" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। সুদূর হইতেও তাঁহাদের করুণ আর্ত্তনাদ রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শুনা যাইতেছিল।

নায়েব গৌরবিনোদকে এক স্বতন্ত্র গৃহে অবরুদ্ধ করা হয়। অপর দশজন মালখানায় ছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে এক ব্যক্তি নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে নায়েব মহাশয়ের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, "গোল করিবেন না। শীঘ্র আমার সহিত বাহির হইয়া পড়ুন।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরে আসিয়া নায়েব মহাশয় কহিলেন, "রঘুসিং, আর এক দিন এই যমালয়ে এরূপ ভাবে থাকিলে

আমার প্রাণবিয়োগ হইত। তুমি আমার জীবনদাতা। বল, এখানে কিরূপে আসিলে?"

যদুসিং কহিল, "সে সব কথা থাক্। এক্ষণ নিঃশব্দে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন।"

দুই মাইল দূরে মাঝিরা নৌকা লইয়া প্রস্তুত ছিল। নায়েব মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া যদুসিংকে চুপে চুপে কহিলেন, "আমি আপাততঃ কিছুদিন নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিব। আমার জন্য কেহ যেন চিন্তা না করে। তুমি কিরূপে আসিলে বল।"

যদুসিং সংক্ষেপে কহিল, "বিশেষ কোন প্রয়োজনে মা ঠাকুরাণী আমাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলাম, রসুলপুরের দারোগা আপনাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়াই আমি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। প্রহরীরা ঘুষ লওয়ায় আমার কার্য্য সহজ হইয়াছে।"

কাশীপুর হইতে আসিতে হইলে, অগ্রে রসুলপুরে আসিতে হয়। তাহার সাত মাইল দূরে কালীতারার পিত্রালয়।

কোথায় রাম রাজা হইবেন, কোথায় তাঁহার বনবাস! কোথায় গৌরবিনোদ দেওয়ানি পদ পাইবেন, কোথায় তাঁহার প্রাণভয়ে পলায়ন! কমলিনীর বিবাহের আর এক সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে। আজ ঘোষজার মোহনপুরে পঁহুছিবার কথা।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## বিপদের উপর বিপদ।

যতসিং যথাসময়ে বাড়ী পঁহুছিল, কিন্তু নায়েব গৌর-বিনোদের সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও বলিল না। নন্দলাল সকল সংবাদ রাখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, "জ্যেঠা মহাশয় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম হইয়াছে। ভগবান্ যখন সুযোগ দিয়াছেন, তখন এই মাহেন্দ্রক্ষণেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। নবাবী আমলের অগণিত মোহর, যত্নসঞ্চিত অসংখ্য রৌপ্যমুদ্রা, বিপুল সম্পত্তি,—এই সকল এখন কাহার ভোগে ব্যয়িত হইবে? নায়েব, তুমি কেবল ভগবানের বিশ্বস্ত ধনরক্ষীর কার্য্য করিয়াছ। অর্থে প্রকৃত অধিকার কাহার?—যে ভোগ করে। টাঁকশালে যে বিপুল অর্থরাশি রহিয়াছে, তাহাতে যেমন তোমার আমার অধিকার, সঞ্চিত ধনে কৃপণদিগেরও সেইরূপ। তবে, এক একবার স্তূপীকৃত গুপ্তধনের ঔজ্জ্বল্য

আমার প্রাণিদের যাহা কিছু সুখ। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কে এখানে নিগৃহে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? তবুও ধনকুবেরগণের যথোদয় হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। সদুপায়ে বিপুল অর্থলাভ অর্জ্জন করিতে পারে? যাহারা পারে, তাহারা ক্ষণজন্মা। কিন্তু সচরাচর আমার কল্পিত প্রণালীই ধনসম্পত্তিলাভের সহজ উপায়।" এইরূপে মনে বিবেকোদয়ের সম্ভাবনা নিবারিত করিয়া, নন্দলাল উমেশের সহায়তায় কালীতারার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নির্দ্ধারিত দিবসে নায়েব মহাশয় বাটীতে না আসায়, কালীতারা ও কমলিনী বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। নন্দলাল প্রকাশ করিলেন, "জ্যেঠা মহাশয় বিশেষ কার্য্য-গতিকে এখন আসিতে পারিলেন না। তিনি বিবাহের সময় উপস্থিত হইতে না পারিলে, অগত্যা আমাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। বিবাহের সকল আয়োজন বৃথা পণ্ড করা যাইতে পারে না।" ইহা শুনিয়া কমলিনী অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একদল পুলিশ আসিয়া ঘোষবাটী ঘেরাও করিল। খানাতল্লাসীতে সন্দেহজনক কিছু না পাইয়া, তাহারা গৌরবিনোদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, কিছু তৈজসপত্র, কয়েকটি তোড়ঙ্গ, একটি শালের

বাক্স ও একতাড়া চিঠি লইয়া গেল। পুলিশ কহিল, নায়েব বাবুর মালামাল লইতে তাহাদের প্রতি হুকুম আছে। নায়েব মহাশয় পলাতক হইবার পর তাঁহার নামে যথাসময়ে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল।

অকস্মাৎ অনেকগুলি লালপাগড়ির যুগপৎ পদার্পণে কালীতারার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অন্যান্য প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক-গণের ন্যায় মৃদু হয় নাই। তিনি কণ্ঠে মেঘমন্দ্রের অনুকৃতি করিয়া, কখনও পুলিশের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছিলেন এবং কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিলেন। একজন কন্‌ষ্টেবল অপরকে কহিল, "মাগীর কি বাজখাঁই সুর রে!" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "সুর তো টেরই পাওয়া যাচ্ছে, চেহারাটা দেখেছিস্ কি মিশ্‌মিশে কালো! ভদ্রলোকের ঘরে এমনতর সহজে মেলা ভার।"

দেখিয়া শুনিয়া কমলিনী দুঃখে ম্রিয়মাণা হইলেন। তিনি কিরূপে প্রবোধ মানিবেন? অধীর হইয়া বালিকা "বাবা গো," "ও গো, আমার বাবা কোথায় গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কালীতারা সে দিন বিশেষ মনঃকষ্টে কাটাইলেন। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ ঘোষজার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মনে মনে খুসী হইলেন, কেবল নন্দলাল ও উমেশ। কন্‌ষ্টেবল ও চৌকিদারেরা চলিয়া গেলে, বৃদ্ধাগণ অতঃপর

ছেলেমেয়ে কাঁদিলে 'কনিষ্ঠ প্রবল' আসিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন।

চিরবাঞ্ছিত পরিণয়ের সকল আশা নির্ব্বাপণ, অপ্রার্থিত অপকৃষ্ট মিলনের দ্রুত আয়োজন, পিতার নিরুদ্দেশবার্ত্তা, গৃহ-সামগ্রীতে পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে কমলিনী এক-রূপ জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। বিপদ একা আসে না। যখন সময় মন্দ হয়, তখন বিপদের উপর বিপদ আসিয়া মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলে। এই দুঃসময়ে তাড়াতাড়ি বিবাহ না দিবার জন্য গ্রামবৃদ্ধেরা পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, "জ্যেঠা মহাশয়ের অনুপস্থিতি দীর্ঘকালব্যাপী হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় কত কালের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখা যায়?" ইত্যাদি যুক্তিতে নন্দলাল সকল প্রতিবাদ খণ্ডন করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিবসে হতচেতনা কমলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। রজতমুদ্রা ও নানা দ্রব্যোপহার লাভে লুব্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কর্ম্মকর্ত্তাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর অষ্টম দিবসে বর বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। কমলিনী তাঁহার নবযৌবনসঞ্চারকালে বিধবা হইলেন। অল্পবয়সে স্বামীকে না চিনিতে, না জানিতে, স্বভাবকোমলা বালিকা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিগড়ে আবদ্ধা হইলেন। সমাজের আইন পুরুষের হাতে। সংযম-

শিক্ষায় অপারগ পুরুষগণ স্বাধিকার প্রতিপাদনে অসমর্থা দুর্ব্বল অবলাজাতিকে অনন্তবিধানের নাগপাশে বন্ধন করিতে কবে পরাঙ্মুখ হইয়াছে ?

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---

### মল্লিক মহাশয়ের বৈঠকখানা।

সুধীরকুমারের আশ্রয়দাতার নাম, দয়ারাম মল্লিক। ইনি হুগলির একজন বিখ্যাত জমিদার। বিনয়, সৌজন্য, উদারতা ও পরোপকারিতার জন্য মল্লিক মহাশয় সকলের প্রিয়। 'তৃণাদপি সুনীচেন' বলিতে যাহা বুঝা যায়, তিনি নিজ চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ্র কেশ, বিস্তৃতায়ত নয়নদ্বয়, পক্ক গুম্ফশ্মশ্রু ও স্থির জলধির ন্যায় সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় হইত। ধনী বা নির্ধন, বিদ্বান্ অথবা মূর্খ, আবালবৃদ্ধ যিনি তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনিই মল্লিক মহাশয়ের মধুর সম্ভাষণে ও সারগর্ভ বচনে পরিতৃপ্ত হইতেন। মদে যেমন 'চাট্', খানায় 'সস্', নিমন্ত্রণে চাট্‌নি, তেমনি মজ্‌লিসি গল্পে পরনিন্দা বিশেষ মুখরোচক। দয়ারাম বাবুর মহৎগুণ, তিনি এই প্রধান উপকরণটী বাদেও কথোপকথন সরস করিতে পারিতেন। তাঁহার বৈঠকখানা প্রতিদিন সায়াহ্নে বিদ্বজ্জনসমাগমে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিত।

নানা সুদৃশ্য আলোকদান, বিবিধ গঠনের কাষ্ঠ, বেতস ও কার্পেটের চেয়ার, মনোহর পুষ্পস্তবকশোভিত টেবিল, সুনিপুণ কারুকার্য্যময় গালিচা ও পর্দ্দা, রবি বর্ম্মা, ক্ষাত্রে, র‍্যাফেল ও অপরাপর কৃতী চিত্রকরগণের মনোমোহন চিত্রসমূহ এবং স্বর্ণজলে মণ্ডিত বহুমূল্য দুর্লভ গ্রন্থরাজিপূর্ণ কাচের আলমায়রা তাঁহার বৈঠকখানার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সেই কক্ষ সুধীরকুমারের আলোচনাপীঠ। তথায় নানাবিধ সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইত। আমাদের ইচ্ছা, পাঠকপাঠিকাগণকে সেই গুরুতর দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়াদির কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিব। ইহাতে যদি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তবে গরীব গ্রন্থকার নাচার। কেহ হয়ত মনে করিতেছেন, 'ভাল রে বাপু, লিখ্‌বে উপন্যাস, দেখাবে প্রেমের বৈচিত্র্য, বিরহোচ্ছ্বাস ও নৈরাশ্য বা মিলন,—তা' নয়, একটা কটমট গুরুপাক আলোচনা এনে ফেল্‌লে!' এরূপ শ্রেণীর পাঠকপাঠিকাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পরিচ্ছেদ বাদ দিয়া পড়িবেন। কিন্তু পড়িলেই বোধ হয় ভাল হয়। গুরু আহারের পর লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা যাইবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

সুধীর মল্লিক মহাশয়কে কহিতেছেন, "সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র ও উপাসনা-মন্দির এই চারিটি সভ্যতার ক্রমবিকাশ ফল।

আমাদের আদিম অবস্থায় ইহার কিছুই ছিল না। মানুষের এই চারিটি প্রধান কীর্ত্তি রক্ষাকল্পে ও তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য চাই শিক্ষা। যে শিক্ষা কেবল প্রতিভাবান্ পশুর সৃষ্টি করে, যাহা প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিগুলিকে সংযত ও উন্নত না করিয়া প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা পশুশক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির উত্তেজক এবং মনুষ্যত্বনিরোধক, যাহা কেবল আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভোগলালসা ও আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি করে এবং অপরের স্বার্থসুবিধা অধিকার সঙ্কোচ করে, যাহা মনোবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে সহায়তা না করে, চরিত্র-গঠন, জাতীয় উন্নতি ও সার্ব্বজনীন হিত যাহার লক্ষ্য নয়, যাহা আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে উপেক্ষা করে ও সংস্কারের নামে কেবল সংহার করিতে চায়, সে অকল্যাণকর জ্ঞান আমরা চাহি না। আমরা চাই সেই শিক্ষা, যাহা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায় পুনর্জ্জীবনদানে সক্ষম, যাহার বৈদ্যুতিক স্পর্শে নীচ উচ্চ হয়, উচ্চ উচ্চতর হয়, পাষণ্ড সাধু হয়, কঠিন কোমল হয়, কোমলহৃদয় মহৎ হয়। চাই সেই শিক্ষা, যাহার প্রভাবে মানুষে দেবত্ব সম্ভবে, যাহার অভাবে মানুষ পশুর অধম হয়। চাই সেই শিক্ষা, যাহা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথ-প্রদর্শক। চাই প্রকৃত শিক্ষা, যাহা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-

সংসাধক,—যাহা জড়তার শত্রু, ক্রমোন্নতির সহচর, অজ্ঞান ও কুসংস্কার বিনাশের অমোঘ অস্ত্র এবং চরিত্র-গঠনের সহায়। উত্তাপ ব্যতীত যেরূপ সূর্য্যের অস্তিত্ব সম্ভবে না, জ্যোৎস্না ব্যতীত চন্দ্রের কল্পনা অসম্ভব, সেইরূপ শিক্ষা ব্যতীত সভ্যতা সম্ভবপর নয়। রাজ্যশূন্য রাজার ন্যায়, স্পন্দনবিহীন দেহের ন্যায় শিক্ষাবিহীন মনুষ্যের অস্তিত্ব নিষ্ফল।”

দয়ারাম। সুধীরবাবু, আপনার কথা শুনিয়া আমি অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। এরূপ সুন্দর ওজস্বিনী ভাষায় আর কেহ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করেন নাই।

সুধীর। আমার অনুরোধ, আমাকে আর ‘আপনি’ সম্বোধন করিবেন না। ‘সুধীর বাবু’ না বলিয়া কেবল ‘সুধীর’ বলিয়া ডাকিলেই আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার শিক্ষা এখনও অনেক অসম্পূর্ণ। আমার মতামতের মূল্যই বা কি? সম্মুখে জ্ঞানের অনন্ত জলধি পড়িয়া আছে। আমি তাহার কূলে বসিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহি।

দয়ারাম। সুধীর, গুণবান্ সুধীর, তোমার মত সুশিক্ষিত যুবক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তুমি দেশের গৌরব হইবে। বল দেখি, আমাদের জাতীয় উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

সুধীর। জাতীয় উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত করা চাই। ব্যষ্টির সমষ্টিই সমাজ। ব্যষ্টি উন্নত হইলে সমষ্টির

উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া উদারতার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের সকলই ভুল ও অপর জাতির সকলই অভ্রান্ত সত্য, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধ অনুকরণ করিলে সুফল ফলিবে না, যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত আর্য্যজাতির বিপুল জ্ঞান ও অতি প্রাচীন সভ্যতা উপেক্ষা করিয়া কেবল বিদেশীয় আচার, বিদেশীয় জ্ঞান আমদানি করিলে চলিবে না। অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থই হইয়া থাকে। তাহা হইতে মহা অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। চাই সামঞ্জস্য,—দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহার যতটুকু আমাদের প্রয়োজন তাহা আমাদিগের নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আমাদের বহুশতাব্দীব্যাপী ঘনান্ধকার তিরোহিত হইয়া নবীন আলোকে সমগ্র দেশ উদ্দীপিত হয়, তাহা করিতে হইবে। কলের পুতুল না সাজিয়া মানুষ হইতে হইবে। উন্নতিসোপানে অধিষ্ঠিত জাতি সমূহের নিকট মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। হিমালয়ের ন্যায় স্বয়ং উচ্চ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহকে উন্নত করিতে হইবে। চাই চেষ্টা,—নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগত চেষ্টা,—অদম্য, ঐকান্তিক, নিয়ত চেষ্টা। চাই আত্মোৎসর্গ। পুনরায় ভারতে জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীরের উদ্ভব হইবে। সিদ্ধির মূলে সাধনা, সাধনার মূলে চিন্তা। একাগ্র হইয়া দিবানিশি যেরূপ ভাবনা করা যাইবে

সেইরূপই সিদ্ধি হইবে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও আংশিক সফলতা সুনিশ্চিত। আকাশে তীর ছুঁড়িলে অন্ততঃ গাছের আগায় পঁহুছিবে। দেখিতে পাই, স্বাবলম্বন দ্বারা সংসারে কেহ মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত, তাহার অভাবে আবার কেহ অনাদৃত ও পরপ্রত্যাশী। চেষ্টা করিয়াই মানুষ আদিম অবস্থা হইতে এত উন্নত। কেবল তাকিয়া হেলান দিয়া, শুইয়া বসিয়া, অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমরা অধঃপতিত, আর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছুটোছুটি করিয়া অপর জাতিরা পুরোবর্ত্তী। পৌরুষবঞ্চিত জাতি দৈবপরায়ণ। উদ্যোগই পৌরুষ। অলসতা তামসিকের লক্ষণ। আমাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে,—পরে শত বাধা, সহস্র অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া, বিপত্তিকে তৃণজ্ঞান করিয়া স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইতে হইবে। স্থির সঙ্কল্প, অমিত উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়? দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির চেষ্টা কে নিরস্ত করিতে পারে? বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি কে প্রতিহত করিতে সক্ষম? হৃদয়ে জপিতে হইবে, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন," শিরে নারায়ণ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" মন্ত্রে কর্ম্মভীরুকে জাগাইতে হইবে,—একটি প্রাণে কোটি হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। ইহাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-নির্ধন, অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী,

জাতিনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সমগ্র ভারতে জ্ঞানের জন্য প্রবল তৃষ্ণা জন্মাইতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্র ইতর, জ্ঞানবান্‌-মূর্খ, শ্রমজীবি, দাসদাসী সকলকেই শিক্ষাদান করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতি মধ্যে পরস্পর বিরোধের কারণ। এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, মনুষ্যের ভিতর মন হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। এই মনের ক্রিয়া উপযুক্ত পথে চালনা করিতে হইবে। অনেক মানবজমি পতিত রহিয়াছে, তাহা আবাদ করা চাই। মস্তিষ্কের চাষে সোণা ফলিবে। জানিবেন, শিক্ষাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "ধন্য সুধীর, দৈবে এমন রত্নে আজ আমার গৃহ উজ্জ্বল!"

এমন সময়ে ডাক্তার শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় তথায় উপনীত হইলেন। "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া বৃদ্ধ দয়ারাম ডাক্তার বাবুকে অভ্যর্থনা করিলেন। সুধীর কহিলেন, "কি শরৎ, আজ যে বড় দেরী করে'?"

শরৎ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "একটুকু কাজ ছিল, ভাই! সে যা হোক্, তোমরা যে আলোচনা করিতেছিলে তাই কর। আমি এসে তোমাদের কথায় একটা প্রকাণ্ড বাধা জন্মাইয়া দিলাম, দেখিতেছি।"

সুধীর। বেশ, শরৎ যে খুব আদব কায়দা দোরস্ত হ'য়ে প'ড়েছ।

শরৎ। বাস্,—আর একটি কথা নয়। বলে' যাও যে বিষয়ে কথা হ'চ্ছিল।

শরৎ এম. বি. পাশ করিয়া সবে হুগলিতে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি মনোহর, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, প্রকৃতি উদার ও মহৎ। হুগলিতে আসিবার পর হইতে তাঁহার সহিত সুধীরের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। উভয়েই উন্নতমনাঃ, উভয়েই সুশিক্ষিত,—মৈত্রী না হইবে কেন?

ইহার কিছু পরেই বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সবাহন তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজেন্দ্র বাবু খাজাঞ্চিগিরি করিতেন। তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুর। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার কেশ ব্রাসের প্রতাপে অবনত হইত না, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা কিঞ্চিৎ চাপা,—তাহার বিশাল রন্ধ্রদ্বয়ে নস্যকণা প্রায়শঃ সংসক্ত থাকিত, দন্তরাজি সামঞ্জস্য-বিরহিত,—তন্মধ্যে দুইটি দন্তসহকারে অধরোষ্ঠের উপর বিরাজ করিত। গুম্ফ পরস্পর অসম্বদ্ধ, শ্মশ্রু 'ছাগলাস্য'। তাঁহার অতিবিস্তৃত উদরপ্রদেশ রক্তমাংসসমুৎপন্ন বৃহৎ ভুঁড়ির চক্রে সুশোভিত ছিল এবং চন্দনতিলক ও নামাবলী উপদংশের শুষ্কক্ষত আচ্ছাদন করিয়া অহরহ বিরাজ করিত। মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের কলেবর খর্ব্ব ও স্থূল। বালকেরা তাঁহাকে "চলন্ত ফুট্‌বল" বলিত, রসিকেরা "বাঁকা শ্যাম" আখ্যা দিয়াছিলেন, অপ্রিয় সত্যবাদীরা "চিতাবাঘ" বলিতেন এবং সাধুর ন্যায় বাহ্যদৃশ্যে ও সর্ব্বদা উচ্চারিত হরিকথায় মুগ্ধা রমণীগণ তাঁহাকে ভক্ত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ভণ্ডামি ও বয়সের আধিক্য বশতঃ তিনি নিঃসংশয়ে অনেক পরিবারে মিশিতে পাইতেন। একটি গুণ তিনি উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছিলেন,—তাহা কৌটিল্য।

রাজেন্দ্রচন্দ্রের বাহন, রামভদ্র দাস, জাতিতে স্বর্ণবণিক, পেশা পোদ্দারি। পোদ্দার মহাশয় সর্ব্বদা খাঁটি সর্ষপ তৈল লইয়া তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অনুগমন করিতেন।

মল্লিক মহাশয়ের বৈঠকখানায় প্রায়শঃ এই দুই প্রভুর আবির্ভাব হইত। আজিও ইঁহারা তথায় শুভাগমন করিলে সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজের বিষয় ?"

শরৎ সংক্ষেপে কহিলেন, "শিক্ষা।"

রাজেন্দ্র। (নস্য লইয়া) ভালই, বেশ, বেশ, ভাল বিষয়ই আ—আ—আঃ (হাঁচি)—রস্ত করিয়াছেন। আমার ছোট ছেলেকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করা যায় কি না এ সম্বন্ধে একটা প্রবল আন্দোলন করিতে পারেন কি ?

সুধীর। আপনার ছেলে কেন, আমার মতে, সকল ছেলেকেই ছয় বৎসর হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত বিনা বেতনে স্কুলে পড়ান দরকার। ঐ বয়সের ছেলেদিগকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে অভিভাবকদিগকে দণ্ডনীয় করা উচিত। মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐরূপ বিধান আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চাই ও কুসংস্কারবর্জ্জিত হিন্দুমতে শিক্ষাদান করা চাই।

রাজেন্দ্র। বালিকাদিগকে আর পড়াইয়া কাজ নাই। শিক্ষা শিক্ষা করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন না। জানেন না কি, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"? তাহাদের শিক্ষা দিলে পুরুষের সমান অধিকার চাহিবে, কোর্টশিপ্ করিবে, কলেজে যাইতে আরম্ভ করিবে, পরে,—মাষ্টারণী, কেরাণী, ডাক্তার, উকীল, জজ, ম্যাজিষ্টর পর্য্যন্ত হইতে দাবী করিবে। এক কথায়, ভারতবর্ষ রসাতলে যাইবে।

সুধীর। স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয়। আপনারা অবশ্য জানেন,

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অর্থাৎ, কন্যাকেও (পুত্রের ন্যায়) পালন করিবে ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে এবং ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবে। বালকদিগকে পুরুষোচিত শিক্ষা ও

বালিকাদিগকে আদর্শ গৃহিণী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আজ কাল অনেকে সংযুক্তবর্ণ শেষ করিয়া স্বামীকে 'প্রাণেশ্বর', 'প্রিয়তম', 'জীবনসর্ব্বস্ব' ও 'হৃদয়বল্লভ' লিখিতে শিখিয়া কিম্বা দু'পাতা প্রেমের কবিতা এবং দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী পড়িয়া আপনাদিগকে বিদুষী জ্ঞান করেন। যাঁহারা নিম্ন বা উচ্চপ্রাইমারি পাশ, তাঁহাদিগকে আঁটিয়া উঠা অতি উচ্চ শিক্ষিত পুরুষেরও অসাধ্য। গণ্ডূষ মাত্র জলে শফরীর আস্ফালন দেখিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। যাহাতে স্বামিস্ত্রীতে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়, যাহাতে স্ত্রীগণ পুরুষদিগের আশা আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহবারি সেচন করিতে পারেন, নৈরাশ্য-পরাজয়ে শান্তির পুণ্যসুধা বিতরণ করিতে সক্ষম হয়েন, বালিকা-দিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদের উদ্দেশ্য সুগৃহিণী লাভ,—বিপদে ধীরা, সম্পদে সংযমশালিনী, কার্য্যে মন্ত্রী, পরামর্শে সখী, স্নেহে মাতা, স্বল্প ও প্রিয়ভাষিণী, সদা প্রফুল্লমুখী, গৃহকার্য্যকুশলা, ধার্ম্মিকা, সুশীলা স্ত্রীলাভ।

শরৎ। ঠিক্,—তোমার তীব্র সমালোচনা সঙ্গত, তোমার প্রদর্শিত আদর্শ গৃহিণীর চিত্র উজ্জ্বল। কিন্তু, এস্থলে ছেলে-মেয়েদের আহারসম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যে

সকল খাদ্যে অম্লযান বেশী, আমার মতে, তাহাদিগকে সেইরূপ খাদ্য দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। কেবল কৃতকার্য্যতার প্রত্যাশা না করিয়া ভাল আহারের বন্দোবস্ত করা ও শারীরিক পুষ্টিসাধনে সহায়তা করা অভিভাবক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সুধীর। তা' শতবার। মানসিক ক্রিয়ার জন্য শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। শরীর মনের নিতান্ত আজ্ঞাবহ দাস নহে। বাহ্যজগৎ আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া মনকে সাড়া দেয়। মনও শরীরের মধ্য দিয়া বাহ্যজগৎকে সাড়া দেয়। তাই বলিয়া শরীরকে বাহ্যজগৎ ও মনের মধ্যবর্ত্তী বার্ত্তাবহ যন্ত্র জ্ঞান করিলে চলিবে না। উভয়ের ভিতর অতি নিগূঢ় জটিল সম্বন্ধ রহিয়াছে। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। শরীর অসুস্থ হইলে মন কাজ করিতে চাহে না। মন অসুস্থ হইলে শারীরিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। মস্তিষ্কের সবল ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বাগ্রে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। কেবল ছেলেদিগকে পড়ার জন্য তাড়া দিলে চলিবে না, অভিভাবকদিগকেও পুষ্টিকর আহার যোগাইবার জন্য তাড়া দিতে হইবে।

রাজেন্দ্র। (নস্য গ্রহণ করিয়া) আপনারা কিনা শিক্ষিত লোক, বলিয়াছেন ভালই। ছেলেরা পড়িবে না, অভি-

ভাবকগণকে দিবেন ধমক। মজা মন্দ নয়। ইস্কুল গুলাকে নিমন্ত্রণের বাটীতে পরিণত করিলেই হয়। দিবারাত্রি পোলাওকালিয়া আর সন্দেশরসগোল্লা খাওয়ান যাইবে। হায়, হায়, দেশের অবস্থা হইল কি? (কাসি) আমরা তো কে—কে—কেঃ (হাঁচি)—বল বার্ত্তাকুদগ্ধ অন্ন খাইয়াই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। (ঘন ঘন কাসি) বল কিহে, রামভদ্র?

পোদ্দার মহাশয় সায় দিয়া কহিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ আছে? সেকালে অল্প পয়সা খরচ করিয়া যে বিদ্যা উপার্জ্জন হইত একালে অজস্র ব্যয়েও তাহা হয় না।"

রাজেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ, রামভদ্র।"

যুক্তিহীন তর্ক দৃষ্টিহীন চক্ষুর ন্যায় নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, সুধীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রলাপোক্তির কোন উত্তর দেন নাই। তিনি জানিতেন, প্রভুপাদের শিক্ষা ইংরেজি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করে নাই।

মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "সকল অভিভাবক পুষ্টিকর আহার যোগাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না।"

সুধীর কহিলেন, "অভিভাবক নিঃস্ব হইলে কর্ত্তৃপক্ষ বিনা-ব্যয়ে উপযুক্ত আহারীয় ও আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ দিতে বাধ্য। অক্ষম পিতামাতার দায়িত্ব রাজাতে বর্ত্তে।"

শরৎ। সুধীরের মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত। যেরূপেই হউক, ভাল পুষ্টিকর আহার যোগাইতে হইবে। নহিলে, অস্থিচর্ম্মসার দৃষ্টিশক্তিহীন অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়ায় কাতর অকালে জরাগ্রস্ত বালক ও যুবকদিগের দলবৃদ্ধি করা হইবে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি কহিলেন, "মল্লিক মহাশয়, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে তো অনেক কথা শুনিলাম। এদিকের কর্ত্তৃপক্ষ যে একছিলিম তামাক দেওয়া সম্বন্ধেও একেবারে নীরব। পুষ্টিকর খাদ্যের তো কথাই নাই।"

বৈঠকখানায় হাসির রোল পড়িয়া গেল। মল্লিক মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুদে আসলে জলখাবার ও পান তামাক আসিল। এতক্ষণে রাজেন্দ্রের মুখমণ্ডল প্রীতিপ্রফুল্ল হইল। তিনি সজোরে গুম্ফ আন্দোলন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর হাসিলেন সুধীর ও শরৎকুমার,—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রকম দেখিয়া।

সুসজ্জিত রেকাবি হইতে খাবারগুলি মুখে ফেলিয়া রাজেন্দ্রচন্দ্র কহিলেন, "তা' আজ কিছু অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে বলিয়া খাইতে বিলম্ব হইতেছে। তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না।"

শরৎ। তা' আর বলে' কষ্ট পাচ্চেন কেন? যেরূপ অগ্নিমান্দ্য, তা'তে পিঁপড়ের জন্যও কিছু থাক্‌বে বোধ হয় না।

জলখাবারের পালা সাঙ্গ হইলে শরৎ কহিলেন, "দেখ সুধীর, আজ সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যা'ক্। আচ্ছা, সেদিন যে ব্যারিষ্টার মিষ্টার্ তরফদার এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মত লোককে সমাজে লওয়া তোমাদের উচিত নয় কি? তিনি খাঁটি হিন্দু। বিদ্যাশিক্ষার্থে যিনি সমুদ্রযাত্রা করিবেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া সমাজকে মানিয়া চলিবেন, তাঁহাকে ত্যাগ করা কখনও উচিত নয়।

সুধীর। ঠিক্ কথা। ঘরের ছেলে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইলে লোকসান ষোল আনা। যাঁহারা এখন আপাততঃ সমাজের বাহিরে, মনে করিও না তাঁহারা কোন দিন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে আসিতে পারিবেন না। আপনার ধন কে ইচ্ছা করিয়া কতদিন আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে? ঘরের ছেলে আপনার হইলে সমাজ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইবে। এখন হাওয়া বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কঠোরতার পরিবর্ত্তে কোমলতা, সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে উদারতা বর্ত্তমান যুগের নিয়ম। তবে যাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিবেন তাঁহাদিগকে কখনও সমাজে

লওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিবেন ও সামাজিক অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবেন তাহাদিগকে আমরা মাথায় তুলিয়া রাখিব। বিলাত ফেরত দিগের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমির সুসন্তান। তাঁহারা সমাজের ভিতর থাকিয়া সামাজিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করিলে প্রকৃত সংস্কারের পথ সুগম হয়। শিক্ষার জন্য যাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সমাজে লওয়া কর্ত্তব্য। সাময়িক পরিবর্ত্তনে সমাজ আপনার নিয়ম শিথিল করিতে বাধ্য।

রাজেন্দ্রচন্দ্র কহিলেন, "মশায়, জাত্ তো টাঁকে।"

সুধীর। তা ঠিক, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে যখন জাতির জন্য আর টাঁকে হাত দিতে হইবে না।

শরৎ কহিলেন, "ধর, সমাজ একখানি বড় জাহাজ। মনে কর, কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাহা এমন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে যে আর তালি দিলে চলে না, নূতন সমাজ গঠন আবশ্যক।

সুধীর। ঐ তোমাদের ভুল। সমাজের অঙ্গে একটা সামান্য ব্রণকে তোমরা বিস্ফোটক মনে কর। মানবশরীরে একটা সামান্য ব্রণ হইলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাণিত অস্ত্র প্রয়োগে তাহা দূর করিতে চাহিবেন? উহা আপনা আপনি

অথবা অল্প চেষ্টায় সারিয়া যায়। সমাজ-শরীর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আরও দেখ, রণাদি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ মানি, কিন্তু উহা ভাবী স্বাস্থ্যের পরিজ্ঞাপকও বটে।

শরৎ। দেখ সুধীর, সমাজ শরীরে মাঝে মাঝে উৎকট বিস্ফোটকও জন্মে। তখন অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। পাপ ও কুসংস্কার সামাজিক ব্যাধি। মিষ্ট কুপথ্যের ন্যায় উহা আপাতমধুর হইলেও পরিত্যজ্য। ব্যাধির অচিকিৎসা বিনাশের হেতু। সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সামাজিক ব্যাধি দূর করা আবশ্যক। তজ্জন্য উপযুক্ত বৈদ্য চাই।

সুধীর। সেকথা অবশ্য স্বীকার্য্য। নহিলে, সময়ে সময়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, লুথার, রুসো ও মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব দেখিতে পাই কেন? আবশ্যক হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ও দুষ্কৃতের দমন হেতু আবার কোন মহাপুরুষ জন্মিবেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র কহিলেন, "মাষ্টার মশায়, বিদ্যাসাগরের নাম করিলেন না?"

সুধীর। হাঁ, বর্ত্তমান যুগে পুরুষপ্রধান, মহাত্মা রাম-মোহন, রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর।

রামভদ্র কহিলেন, "মশায়, বিদ্যাসাগর ধন্য। বিধবা-বিবাহ

প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় ভাগ্যবান পুরুষগণকে সুখী হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

সবিস্ময়ে মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "সে কি, রাজেন্দ্রবাবু, আপনার না পঞ্চান্ন বৎসর বয়স!"

কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, "পঞ্চান্ন বলিয়া একেবারে যে আকাশ হইতে পড়িলেন! কেশ শুভ্র হইলেই কি বয়স বেশী হয়? কেদার ঘোষের ছেলের সাত বছরে চুল পাকিল কেন? কলিযুগে আয়ু একশত কুড়ি বৎসর না? রামভদ্র, পাঁজিতে কলিযুগের বর্ণনা দেখত।

শরৎ কহিলেন, "আর পাঁজি দেখিতে হইবে না। ধন্য প্রবৃত্তি। মুখুয্যে মশায়, বয়সে প্রবীণ হইলেও উৎসাহে আপনি নবীন বটে!"

রাজেন্দ্র। স্ত্রীবিয়োগ যে হইয়াছে, সেটা বুঝি গণনায় আনিবেন না? আপনারা কি না শিক্ষিত লোক—

শরৎ। আহা, পত্নীহারা রাজেন্দ্র বাবু বৎসহারা গাভীর ন্যায় কেবল হাম্বা হাম্বা করিতেছেন।

রাজেন্দ্র। ঠাট্টা করেন কেন? (সজোরে নাসারন্ধ্রে নস্যপ্রদান) একটি বার বছরের বিধবাকে গৃহিণী করিবার যদি সুবিধা ঘটিয়াছে তা আপনাদের কথায় ছাড়িয়া দিই আর কি? হেঁ—এ—এ—এ—এ—এচ্ছো। (ভয়ঙ্কর শব্দে হাঁচি)।

শরৎ। জীব সহস্র।

রাজেন্দ্র। মাষ্টার মহাশয়, বলুন তো আমি বিদ্যাসাগরী মতে দারপরিগ্রহ করিতে পারি কি না ?

শরৎ। তা আর পারেন না ? এই নবযৌবন, কান্ত বপু, তদুপরি একটি ছেলে দারোগা। ঘরে বাইরে 'উপরি'। আপনার মত লোক বিয়ে করবে না তো কে করবে ?

রাজেন্দ্র। ডাক্তার বাবুর রস যে গড়াইয়া পড়িতেছে ! কিছুক্ষণ বিদ্রূপ ঢাকা দিয়া রাখুন। (কাসি) সুধীর বাবু, বলুন দেখি, বিদ্যাসাগর ধন্য না শরৎ বাবু ধন্য ? কাহার মত অগ্রগণ্য ? (নস্যগ্রহণ ও হাঁচি)।

সুধীর। বিদ্যাসাগর ধন্য শতবার! তিনি মহাপুরুষ। তাঁহার বিশেষত্ব—নির্ভীকতা, সরলতা, কঠোরে কোমলতা, পরোপকারপরায়ণতা, উদারতা, অপরিমিত দানশীলতা ও অসীম স্বার্থত্যাগ। বিদ্যার সাগর আছেন অনেক, কিন্তু বিদ্যা-সাগর কয়টি ? এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা দুইটি সংস্কারকার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, একটিতে রাজকীয় বিধির সহায়তা লইয়াছিলেন,—সেটি সমাজ গ্রহণ করে নাই। অপরটিতে কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য লয়েন নাই, সেটি সমাজ আপনা-আপনি প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বহু চেষ্টা, বহু স্বার্থত্যাগেও বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় নাই ; বিনা কষ্টে, বিনা

আইনে বহুবিবাহ শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বালবিধবাদিগের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ দিয়া সুখী করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সুবিধা অসুবিধা দুই ওজন করিয়া দেখিলে মনে হয়, এক উপায় অবলম্বন করিলে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায় ও বিধবাবিবাহ আবশ্যক হয় না। শিশুকন্যাদিগের বিবাহ না দিয়া যদি ২৩ বা ২৪ বৎসরের যুবকগণের সহিত প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ দেওয়া যায়, তবে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন না করিলেও চলিতে পারে। এখনই সুপাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে নানা কারণে মেয়েদের কিঞ্চিদধিক বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। তাহাদের বিবাহের বয়স ক্রমেই বাড়িতেছে। সমাজ ধীরে ধীরে আপনাআপনি আবশ্যকীয় সংস্কারগুলি করিয়া লইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের স্রোত রোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। অনেক সভ্য সমাজে কত রমণীকে বাধ্য হইয়া চিরকুমারী থাকিতে হয়। আমাদের দেশে তবু প্রত্যেক স্ত্রীলোক পত্নী হইতে পারেন। অদৃষ্ট দোষে যদি কেহ বিধবা হয়েন, আমার মতে, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ পথ। সব দেশেই কোন না কোন শ্রেণীর 'নান্' (Nuns) আছে। বিলাতী 'নানেরা' 'কন্‌ভেন্টে' থাকেন। আমাদের দেশীয় বিধবাগণ গৃহে গৃহে বিরাজ করিয়া 'নান্' সম্প্রদায় অপেক্ষাও

সমাজের বেশী উপকার করেন। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শচরিত্রা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা, পরহিতরতা, শুশ্রূষাবতী, ধৈর্য্যশালিনী, গুণবতী বিধবাদিগের পুণ্যপাদস্পর্শে হিন্দুর গৃহ পবিত্র। হিন্দুবিধবা হিন্দু গৃহে মূর্ত্তিমতী দেবী। সমাজে ব্রহ্মচারিণীরও আবশ্যক আছে। ভোগে ভোগের বৃদ্ধি হয়। সংযমেই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত মহত্ত্ব। আর এক কথা বুঝিতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ কেবল শরীরের সম্বন্ধ নয়, উহা আত্মায় আত্মায় মিলন।

দয়ারাম। সুধীর, তোমার যুক্তি ও হিন্দু বিধবার গৌরব-চিত্র বড়ই সুন্দর। সকল আলোচনাতেই তোমার কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে।

শরৎ। এমন না হ'লে সুধীর আমার শিক্ষক, সহচর ও বন্ধু!

এতক্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চুপ করিয়াছিলেন। আলোচনার ঝড় কিঞ্চিৎ থামিলে তিনি কহিলেন, "দেখিতেছি, আপনারা তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পরিপক্ক! কিন্তু মনুসংহিতাটা পড়া হয় নাই। মাষ্টার মশায় যে বলিলেন, অধিক বয়সে বালিকাদের বিবাহ দিতে হইবে,—ওটা কি খ্রীষ্টানির অনুকরণে? আপনার কি জানা নাই?—

"অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী, নববর্ষে তু রোহিণী"। তার পর কি রামভদ্র? ওহো, মনে হইয়াছে, মনে হইয়াছে,—

"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে গর্দ্দভী অপ্সরা ভবেৎ।"

সুধীর। সে কি, মুখুযো ম'শায় ?—

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা—"

রাজেন্দ্র। আহা থামুন না, মাষ্টার মশায়,—ঠিক মনে পড়িয়াছে—

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধে রজস্বলা।"

আপনারা কি কন্যাকে রজস্বলা করিয়া ঘরে রাখিতে চান ?

সুধীর বিরক্তির সহিত কহিলেন, "আপনারা তো গৌরীদান করে' করে' বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষকে হাঁফ্ ছাড়াইয়াছেন। আপনারা কিন্তু গৌরীদান করেই খালাস। তার পর অদৃষ্টদোষে যদি সেই বালিকা বিধবা হয়, তবে ঐ কচি মেয়েটিকে দুয়ারে শিকল দিয়ে, ঘর বন্ধ করে, নির্জ্জলা একাদশী করাবেন, আর নিজেরা পুত্র কলত্র সহ খাবেন মুড়িঘণ্ট ও কোপ্তা-কোর্ম্মা-কাবাব !"

রাজেন্দ্র। বড় ঝাঁজ্—মাষ্টার মশায়ের কথায় বড় ঝাঁজ্। একটুকু মোলায়েম করিয়া বলুন।

শরৎ। আপনারা করিবেন গরম আর আমরা হব নরম ? মজা মন্দ নয়। আপনারা চান একটি আট বছরের বালিকাকে অকালপক করিতে ( যদিও স্ত্রী হইবার জন্য সে শরীর ও মন উভয়তঃ অগ্রসর হয় নাই ) তার পর চান তা'কে ডুবাতে

(যদিও সে জানেনা স্বামী কে বা স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ কি?)— আপনারা পিতামাতা আত্মীয় স্বজন মিলে' ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাৎসল্যের আতিশয্যে দুধের মেয়ের দিবেন বিয়ে, তার পর আপনাদের অর্ব্বাচীনতায় সে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ও স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হ'লে বল্‌বেন, বাল্যকালে সন্তান প্রসব করা প্রকৃতির নিয়ম, সূতিকা প্রভৃতি স্বাভাবিক স্ত্রীব্যাধি, ব্রহ্মচর্য্যই বালবিধবার পরম ধর্ম্ম। আর, ইহার উপর শত বন্ধন, বন্ধনের উপর বন্ধন দিয়া সেই হতভাগিনীকে জ্বালাতন করিয়া পুরুষত্বের বড়াই করিবেন!

রাজেন্দ্র। ডাক্তার বাবু ধন্য! কথার কি মিষ্টতা! তাৎএ ফোস্কা না পড়িয়া যায় না।

শরৎ। কেন, "যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল", মন্দ কি?

তার পর শরৎ সুধীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা সুধীর, রাঢ়ে বারেন্দ্রে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমার মত কি? সেদিন মুরারীধর বাবুর সঙ্গে এই লইয়া আমার খুব তর্ক হ'য়ে গেছে। আমি ডাক্তারী হিসাবে বলিতে পারি, পিতামাতার বংশের মধ্যে যত ব্যবধান থাকে ততই ভাল,— রক্তটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা চাই সমজাতীয় নূতন রক্তের সংমিশ্রণ।"

সুধীর। ঠিক—সকল হিসাবেই এইরূপ বিবাহের প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ব্যতীত বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় নামে দুই শ্রেণীর দশ জন ব্রাহ্মণ তো কানাকুব্জ হইতে আসেন নাই। সেই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়া আজ বিভিন্ন আখ্যায় পরিচিত। আগে পথ ঘাট ভাল ছিল না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে অনেক সময় লাগিত ও প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হইত। তখন রাঢ়দেশ হইতে বারেন্দ্রভূমিতে কন্যা পাঠানো তাহার নির্ব্বাসনের সমতুল্য ছিল। কাজেই সেকালে এরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল না। এখন ইহাতে অসুবিধা তো একেবারেই নাই, বরং লাভ ষোল আনা। এ সব সংস্কার সময়সাপেক্ষ। হ'বে সব। তবে, এই উভয় শ্রেণীতে বিবাহ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কুলীন, বংশজ (বা কাপ) ও শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। এখন হইতে সকলে মেল্ ভাঙ্গিতে আরম্ভ কর। যে সকল গুণের তারতম্যানুসারে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভাগ করিয়াছিলেন সে সকল গুণের সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত আজ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আছে শুধু অন্যায় গরিমা। মৃত দেহের আর মিথ্যা বড়াই কেন? ভাঙ্গ মেল্,—একে অপরের সহিত দ্বিধাশূন্য ভাবে মিশিয়া যাও।

শরৎ। 'দেখ সুধীর, আর সময়ের মুখাপেক্ষা না করিয়া জনকতক কর্ম্মবীরের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আত্মোৎসর্গে সংস্কার সহজসাধ্য হইবে।

এমন সময়ে বৰ্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর বাবু তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী দয়ারাম বাবুর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি রাস্তা হইতে জিজ্ঞাসিলেন, "সুধীর. ওখানে আছ?" "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া সুধীর গাত্রোত্থান করিলেন। মল্লিক মহাশয় আসনত্যাগ করিয়া কহিলেন. "সে কি, তারিণী বাবু যে, আসুন, আসুন। আজ যখন এ দিকে বেড়া'তে এসেছেন. তখন আমার কুটীরে একবার পদধূলি না দিলে যেতে দিচ্চি নে।" আবার জলখাবার আসিল ও কথোপকথন আরম্ভ হইল। এতটা সমাদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইল। কিন্তু তাঁহার অসন্তোষ বরফের মধ্যস্থিত উত্তাপের ন্যায়, ভস্মরাশিতে আবৃত অগ্নিকণার ন্যায় প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে অবসর বুঝিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগন্তুককে জিজ্ঞাসিলেন,—

"মশায়ের নাম?"

"শ্রীতারিণীপ্রসাদ চৌধুরী।"

"নিবাস?"

"মালদহ।"

"এখানে থাকা হয় কোথায় ?"

"একটি ভাড়াটে বাড়ীতে।"

"কি কর্ম্ম করা হয় ?"

"ছেলেদের পড়াশুনা দেখি।"

তারিণী বাবুর আকৃতি তত মনোজ্ঞ নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে প্রথম হইতেই পাঠশালার পণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন। এতক্ষণে প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া তিনি মনে মনে বড় খুসী হইলেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র শিক্ষকদিগকে মানুষের মধ্যে গণ্য করিতেন না। কেবল স্বাধীনপ্রকৃতি সুধীরের সহিত তিনি ভয়ে ও দায়ে সম্মান রক্ষা করিয়া কথা কহিতেন। আর সকলকে তৃতীয় পুরুষে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" গোছের সম্বোধন করিতেন। তারিণী বাবুর পেশা জানিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে "তুমি"তে নামিলেন ও গুম্ফে চাড়া দিয়া অধরে কাষ্ঠ হাসির অবতারণা করিয়া কাসিতে কাসিতে কহিলেন, "তাই বলিলেই হয়! সোজা করিয়া বলিলেই পার ছেলেদিগকে ঠ্যাঙ্গাও অর্থাৎ মাষ্টারি কর। অত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বল কেন, বাপু ?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহারে সুধীরকুমার রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "খাজাঞ্চি বাবু, ভদ্রভাবে কথা কহিবেন। কাহার

সহিত কিরূপ সম্মান রক্ষা করিয়া কথা কহিতে হয় তাহা আপনার জানা উচিত।”

রাজেন্দ্রচন্দ্র কুপিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, “সম্মান? কাহার সম্মান? আপনারা কিনা শিক্ষিত লোক! ঐ কি একটা শব্দ শিখিয়াছেন, ‘সম্মান’। মাষ্টারদের আবার সম্মান?—অবশ্য, আপনি বাদে। বলুন দেখি, উহারা কি হাকিম, না দারোগা, না আফিসের বড় কেরাণী? উহাদের জন্য অভিধানে “তুমি” শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। ‘তুমি’ কথাটা কি ফেলিবার জিনিষ, রামভদ্র?”

রামভদ্র। ‘তুমি’ কি একটা তুচ্ছ কথা? বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র কোকারামের জন্য কত গ্রাজুয়েটকে অন্ন ও বেতন দিয়া প্রাইভেট শিক্ষক রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকেও বুঝি ‘আপনি’ সম্বোধন করিতে বলিবেন?

রাজেন্দ্র। (হাঁচি) সত্য—সত্য—সত্য।

শরৎ। মল্লিক মশায়, আপনার বাটী হইতে এই নন্দী ভৃঙ্গী দু’টিকে বাহির করিয়া না দিলে এখানে ভদ্রলোকের আসা কঠিন। মানীর মাননাশ মৃত্যুতুল্য। যেখানে মানীর সম্ভ্রমহানি হয় সেস্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত। (প্রস্থানোদ্যত)

রাজেন্দ্র। আহা, চটেন কেন, ডাক্তার বাবু? আপনার কার্য্য তো “তুমির” অন্তর্ভুক্ত নয়।

দয়ারাম। শরৎ বাবু, অনুগ্রহ করিয়া আর একটুকু বসুন। দেখুন, মুখুয্যে মশায়, এই যে সুধীর ও শরৎ বাবু আমার বাটীতে দয়া করিয়া প্রত্যহ আসেন, আর ভাগ্যক্রমে আজ চৌধুরী মহাশয় এখানে পদধূলি দিয়াছেন, ইঁহারা অতি সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সজ্জন ব্যক্তি। ভরসা করি, আপনি ইঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন। আপনি বোধ হয় জানেন না, তারিণী বাবু বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর। আপনি যেরূপ অর্থের তুলাদণ্ডে সম্ভ্রম পরিমাপ করেন তাহাতেও উনি কম নহেন। তারিণী বাবু মাসে ৮০০৲ আট শত টাকা বেতন পান ও ট্র্যাভেলিং এলাওয়েন্স লইয়া মাসিক প্রায় হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার গাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলেও তিনি এত চমকিত হইতেন না। তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "তা' এই কথাটি প্রথম বলিলেই হইত। (কাসি) শিক্ষাবিভাগের চাকুরীতে এত মোটা বেতন! তারিণী বাবু, রাগ করিবেন না,—আপনি একটা ম্যাজিষ্ট্রেরের মত পান বেতন,—আপনি পরেন ধুতি!"

তারিণী বাবু। (হাসিয়া) আজ্ঞে, ধুতি হচ্ছে আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। কার্য্যগতিকে তো সঙ্ সাজ্‌তেই হয়, তা'

অন্য সময়ে যতটা পারা যায় ধুতি পরে' তৃপ্তি লাভ করায় দোষ কি ?

রাজেন্দ্র। হউক জাতীয় পরিচ্ছদ,—কিন্তু নিতান্ত গুরু মশায়ের বেশে আপনার থাকা উচিত নয়। আপনার অঙ্গ সর্ব্বদা হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-বুটে আবৃত থাকা চাই। অরে, কে আছিস্ রে ? একটা বড় কেদারা দে,—ইন্স্পেক্টর বাবুকে একটা বড় কেদারা দে। (ঘন ঘন কাসি) মাষ্টার মশায়, আপনাকে এখন হইতে আরও অধিক সম্মান করিব। শিক্ষা-বিভাগে সদর-আলার মত বেতন! কালে কালে হইল কি! নারায়ণ, তুমি জান।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল। বৈঠকখানায় হাসির রোল উঠিল। সে হাসিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অকারণে যোগ দিলেন। হাসিলেন না কেবল রামভদ্র। বেচারি ব্যাপার দেখিয়া একেবারে মুষড়িয়া গিয়াছিল।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিল, "শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের ধারণা এত নীচ কেন ?" সুধীর কহিলেন, "অনেক স্থলে, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, নীতির নামে দুর্নীতি, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানের বীজ উপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক বেঙাচি সৃষ্টি হইতেছে। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, যাহার

কর্ণ আছে অথচ শ্রবণশক্তি নাই, চক্ষু আছে অথচ দর্শনশক্তি নাই, নাসিকা আছে অথচ ঘ্রাণশক্তি নাই, তাহাকে পুত্তলিকা কহে। আর, যাহার স্মৃতিশক্তি আছে অথচ বোধশক্তি নাই, মস্তিষ্ক আছে অথচ স্বাধীন বিচারক্ষমতা নাই, আহারনিদ্রা-ভয়াদি স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তিগুলি আছে অথচ সংযমাকাঙ্ক্ষা নাই, উচিত্যানৌচিত্যবোধ আছে অথচ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা নাই, অধীত সন্নীতিমালা যাহার কণ্ঠস্থ অথচ তাহা পালনের চেষ্টা নাই, নানাশাস্ত্রে যাহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি অথচ ঈশ্বরে আস্থা নাই, রক্তমাংস অস্থি সকলই আছে অথচ ক্রিয়াশক্তি নাই, তাহাকে বেঙাচি কহে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই সকল বেঙাচি বেশী সৃষ্ট হওয়ায় শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের ধারণা এত নীচ হইয়াছে। আর এক কথা। অনেকের মতে, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থার্জ্জন;—যে যে পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম তাহার শিক্ষা সেই পরিমাণে সফল। এই ভ্রান্ত ও দূরনীয় ধারণা স্বল্পার্জ্জনক্ষম শিক্ষিতদিগের বর্ত্তমান অনাদরের মূল কারণ।”

তারিণী বাবু কহিলেন, “সুধীরের বর্ণনানৈপুণ্য চমৎকার, যুক্তি অকাট্য। উহার কথা শুনিলে কর্ণকুহর তৃপ্ত হয়, হৃদয় পুলকিত ও মন উন্নত হয়। কেবল কেশ শুক্ল হইলেই বৃদ্ধ হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধই প্রকৃত বৃদ্ধ।”

লজ্জায় সুধীরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "এই জন্যই তো আমি সুধীর বাবুর ভক্ত শিষ্য।"

সুধীর। সে কি? আপনার নিকট আমার অনেক শিখিবার আছে। আমাকে শিষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

এ সব ব্যাপার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষতঃ, বেঙাচির বর্ণনা তাঁহার নিকট বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল। কাজেই তিনি দুই চারিবার হাই তুলিয়া ও তুড়ি দিয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিলেন। অনন্তর কহিলেন, "শ্রীবিষ্ণু, আদত কথাটাই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বলি, পণপ্রথা রহিত করিবার জন্য আপনারা চেষ্টা করিতেছেন কি? আমার একটি অরক্ষণীয়া কন্যা আছে। আপনারা না জাগিলে আর যে কেহ জাগিবে সে ভরসা বৃথা। শীঘ্র পণপ্রথা রহিত করিবার জন্য কলিকাতায় স্কোয়ারে স্কোয়ারে, টাউনহলে এবং প্রতি সহরে বক্তৃতা করুন। আর সংবাদপত্রে বিশেষ যুক্তি দর্শাইয়া প্রবন্ধ লিখিতে থাকুন।"

সুধীর। ইহাও জবরদস্তি করিয়া হইবে না। সভা সমিতিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা'র যেটুকু সাধ্য তিনি নিজ পুত্রের বিবাহে সেইটুকু উদারতা দেখাইলেই এই অনিষ্টকর প্রথা উঠিয়া যাইবে।

শরৎ। শুনিয়াছি, মুখুয্যে মশায় নাকি পুত্রের বিবাহে কে গরীব ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। বাস্তবাটি এবং যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও নাকি ভদ্রলোকটি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই?

রাজেন্দ্র। (ঘন ঘন কাসি) নারায়ণের ইচ্ছা—"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" —তা—তা আপনাকে কে বলিল? সে বেহাই এর 'যথা'ই বা ছিল কি, 'সর্ব্বস্ব'ই বা ছিল কি? আর আমাকে দিবেনই বা কি?

শরৎ। কেন, 'যথা' ছিল তাঁর ঘটি, 'সর্ব্বস্ব' ছিল বাটী। তাতেও আপনার উদর ভরিল না?

রাজেন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর কথা! নারায়ণ, তুমি জান। সে কোন্ কালের কথা। অতীত লইয়া তো খুব আন্দোলন করিতেছেন, অথচ বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তখন পণ লওয়ার নিয়ম ছিল।

শরৎ। তা বটেই তো।

এমন সময়ে মুরলীধর বাবু আসিলেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র খুব আন্দোলন করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিলেন, "আসুন, বাড়ুয্যে মশায়, আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক। নমস্কার—নমস্কার। হেঁ—হেঁ ভাল আছেন তো?

শরৎ। দেখুন, মুখুয্যে মশায়, বল্‌লে রাগ কর্‌বেন না। ভদ্রতার মাত্রাটা আর একটুকু কমাইলে ক্ষতি কি? এই যে আপনারা দংষ্ট্রাপংক্তি বিস্তার ক'রে, চিঁহি চিঁহি কর্‌তে করতে নমস্কার ও গুরুতর অভ্যর্থনা করলেন, এসব কি বাড়াবাড়ি নয়? আমরা কেবল বাহিরটাই দোরস্ত করচি। ভিতরটা সাফ্‌ কর্‌বার দিকে লক্ষ্য ক'জনার।

শরতের কথায় বৈঠকখানায় হো হো শব্দে হাসির তরঙ্গ উঠিল।

বাবু মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লিক মহাশয়ের প্রতিবেশী। কেরাণীগিরি গ্রহণের পর দশ বৎসর মল্লিক মহাশয়ের গৃহে বাস,—কাজেই বিনা খরচে উদরপূর্ত্তি, তদুপরি কৃপণতা ও বরাবর 'উপরি' পাওনা, ইত্যাদি উপায়ে মুরলীধর বেশ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগের পর বিধবা ভ্রাতৃবধূর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া কেরাণী বাবু হঠাৎ ধনবান হইয়া পড়েন। কাজেই, টাকার 'গরমে' তিনি কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। তাঁহার দুই পুত্র, আত্মারাম ও জনার্দ্দন। কোন কালেই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করা হয় নাই।

হাসি থামিলে দয়ারাম মুরলীধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাঁড়ুয্যে মশায়, বড় দেরীতে এসেছেন। আজ সুধীর

ও শরৎ বাবু শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুন্দর উপদেশপূর্ণ কথা কহিয়াছেন। আমার মতে, আত্মারাম ও জনার্দ্দনের শিক্ষা-বিষয়ে ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে ভাল হয়। ইঁহারা বিদ্যার জাহাজ।

শরৎ। সুধীর বটে। জাহাজ দূরের কথা। আমি একখানি সামান্য ভেলাও নই।

রাজেন্দ্র। (হাসিয়া) একটা রাজার প্রাণ যেমন তোতা-পাখীর মধ্যে ছিল, আমাদের মাষ্টার মশায়ের প্রাণও তেমনি বই এর ভিতর!

দয়ারাম। সেটি বিশেষ প্রশংসার কথা। যে বেশী পড়ে সে বেশী শিখে। বিদ্বানের তুল্য ধনী কে? বিদ্বান্ যেখানেই যান সকলকেই তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কিছু না কিছু বিতরণ করিতে পারেন। তাঁহার সকল ধনসম্পত্তি তাঁহারই ভিতর। বই-ই আমাদের প্রকৃত সুহৃৎ। নির্জ্জনবাসী হউন, সঙ্গে একখানি বই থাকিলে তাহাই সহস্র সঙ্গীর সমকক্ষ। একখানি বই শতমুখে কথা কয়। ঐ আলমায়রা দেখিতেছেন, উহাতে কত সুধী ব্যক্তির অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি রহিয়াছে। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই মৃত, কিন্তু এখনও তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের ভিতর জীবিত। এখনও তাঁহারা ঐ বইগুলির ভিতর দিয়া কথা কহেন। কত যুগ অতীত হইয়াছে,

তবু এখনও তাঁহারা আমাদিগকে নির্ম্মল আনন্দ, হিতোপদেশ, জ্ঞান ও সুখশান্তি বিলাইতেছেন। ধন্য তাঁহারা! ধন্য তাঁহাদের গ্রন্থনিচয়! ধন্য যাঁহারা ঐ গ্রন্থগুলি পড়িয়া সুখী!

তারিণী বাবু। মল্লিক মশায়ের সহিত আমি একমত; আপনার ভাবগুলি বেশ পরিষ্কার।

শরৎ। তবে, বুঝ্‌লেন কিনা, সুধীর একটুকু বাড়াবাড়ি করে। বই ও বৌ ঠিক্ একই রকম। বৌয়ের সঙ্গে যেমন দিনরাত মুখোমুখি হ'য়ে বসে' থাকা ভাল লাগে না, মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা দরকার, তেমনি বইএর সম্বন্ধেও।

দয়ারাম। সে যা' হোক্,—মুরলীধর বাবু, ইঁহাদের সহিত ছেলে দু'টির লেখাপড়া সম্বন্ধে পরামর্শ করিলে ভাল হয় না কি?

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ—তা—পরামর্শ করা মন্দ কি? তবে বুঝ্‌লেন কিনা, ওদের শিক্ষার জন্য বৃথা অর্থব্যয় করা অনাবশ্যক। যদি অদৃষ্টে থাকে, ওরা আপনা আপনি লেখাপড়া শিখিবে। তা' নইলে, হেঁ—হেঁ সহস্র চেষ্টায়ও কিছু হ'বে না।

সুধীর। আপনার ছেলে দু'টি কোন্ ক্লাসে পড়ে?

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ—ওরা সামান্য দু'চারিখানি বই পড়ে। তা' আমিই পড়াইতে পারি। তাই হেঁ—হেঁ—বুঝ্‌লেন কিনা, ওদের এখনও স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় নাই।

সুধীর। ( সবিস্ময়ে ) সে কি ? এত বড় ছেলেদের স্কুলে দেন নি !

মুরলীধর। তা—তা ওরা তেমন বড় কি ? ছেলে মানুষ বই তো নয়। আর, হেঁ—হেঁ স্কুলেই কি আজকাল ঠিক পড়া হয় ?

শরৎ। ছেলে মানুষ বই কি ? আত্মারামের বয়স পনের, জনার্দ্দনের তের। বুঝ্‌লে সুধীর, আপাততঃ কিছু খরচ হ'বার আশঙ্কায় উনি ছেলে দু'টিকে মূর্খ করিয়া রাখিতে চান। ওদের না দিয়াছেন স্কুলে, না রেখেছেন কোন প্রাইভেট মাষ্টার। বই পর্য্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে চালান। কাজেই, ছেলে দু'টি হয়েছে 'ষাঁড়ের গোবর'। ওরা না শিখেছে লেখা-পড়া, না জানে ভদ্রতা।

সুধীর। ছেলে মেয়ে খারাপ হয় পিতামাতার দোষে, উপযুক্ত শাসনের অভাবে।

মুরলীধর। আমি মধ্যে মধ্যে জুতো খড়ম ছাতি দিয়ে প্রহারও তো করি যথেষ্ট। ওরা যে হেঁ—হেঁ কিছুতেই শোধ্‌রাবার নয় তা' বুঝেন না।

সুধীর। যখন তখন বিষম প্রহার করাকে শাসন বলে না। উহা নৃশংসতার পরিচয় মাত্র। কঠোরতায় ছেলে মেয়েদের মন বিগড়াইয়া যায়, কোমলতায় বশ হয়। বালকবালিকা

পিতামাতাকে কেবল ভয় করিবে এরূপ শাসন আমরা চাহি না, যাহাতে তাহারা অভিভাবকগণকে ভয় ও শ্রদ্ধার সহিত ভাল-বাসে তাহাই করিতে হইবে।

শরৎ। ভাল মজা! আত্মারাম ও জনার্দ্দন ওঁকে না করে ভয়, না করে সম্মান। ভালবাসার তো কথাই নাই! অধিকন্তু, অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগে উহারা বিশেষ দক্ষ।

সুধীর। কি লজ্জার কথা, কি আক্ষেপের বিষয়! গৃহে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইলে ও সৎসঙ্গ পাইলে কখনও এরূপ হইত না। আমার বিশ্বাস, আপনারা ছেলেপিলের সম্মুখে সংযতভাবে কথা কহেন না বা সংযত ব্যবহার করেন না। উহাই সকল দোষের মূল। বালক বালিকারা বড় অনুকরণপ্রিয়।

শরৎ। মুরলীধর বাবু, শুনিয়াছি ওরা নাকি মা'কে পর্য্যন্ত কটূক্তি করে?

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ—তা' তো ঠিকই বলেছেন। তা—তা আমাকেই মানে না, তা' আর গর্ভধারিণীকে?

সুধীর। সেটি আপনার দোষ। ক্ষমা করিবেন,—আমার বোধ হয়, যে গৃহে স্বামী স্ত্রীকে সম্মান ও সমাদরের চক্ষে না দেখেন এবং সকলের সমক্ষে হেয় করেন বা প্রকাশ্য ভর্ৎসনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, সে গৃহে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

রাজেন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর! নারায়ণ,—কথা না আগুনের

ছিটা! বাঁড়ুয্যে মশায়, অশুভক্ষণে বাটী হইতে এস্থানে আসিয়াছেন।

দয়ারাম। সে যা' হোক্, এখনও সময় আছে। মুরলী-ধর বাবু, আর কালবিলম্ব না ক'রে ছেলে দু'টিকে স্কুলে দিন্।

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ—তা—তা ঠিকই বলিয়াছেন। তবে কিনা, খরচ বলেই পিছুই। আমরা হ'লেম গরীব লোক,—ছেলেদের কিরূপে শিক্ষা দিব?

শরৎ। আহা, আকাঁড়া চা'লের ভাত বই ওঁর কিছু জোটে না, আর ছ'মাস ন'মাস পরে এক বেলা মৌরলা মাছ খেতে পান মাত্র। কেবল ষাট সত্তর হাজার টাকা বাদে আর কিছুই তো ওঁর সম্বল নেই।

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ নিজের আয়ু ও পরের অর্থ সকলেই বেশী দেখে। আপনারা বুঝেন না যে আমি দিবারাত্রি 'পড় বাবা' 'পড় বাবা' কহিয়াও আত্মারাম ও জনার্দ্দনকে কিছু শিখাইতে পারি নাই। যা'দের হ'বার নয় তা'দের কোন কালেই কিছু হ'বে না। আমাকেই যেন মূর্খ বলিতে পারেন। আমার বন্ধু মুন্সেফ বেচারামবাবুর ছেলের কিছু হ'ল না কেন?

শরৎ। কারণ একই। মুন্সেফ হ'লেই যে তা'র ছেলে বিদ্যাদিগ্গজ হ'বে এমন কথা শাস্ত্রে লেখে না। বাঁড়ুয্যে

মশায়, আপনি পিতা হইয়া নিজের দায়িত্ব ভুলিয়া ছেলে দু'টির সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহার ফলভোগ অবশ্য করিতে হইবে। আপনার জীবদ্দশায়ই উহারা সব উড়াইবে।

মুরলীধর। হেঁ—হেঁ সে গুড়ে বালি—সব ব্যাঙ্কে।

শরৎ। (সহাস্যে) তবে নাকি, কিছু নেই?

মুরলীধর। তা—তা—হেঁ—হেঁ যা' কিছু আছে, আমি বেঁচে থাক্‌তে—

শরৎ। না উড়াইলেও, আপনার সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বেই সব নিঃশেষিত হইবে, কীর্ত্তিধ্বজাও পতপত শব্দে উড়িবে। যে দুইটি মুষল সৃষ্টি হইয়াছে, উহারাই আপনার চক্ষুদান করিবে।

মুরলীধর। (কপালে করাঘাত করিয়া) হেঁ—হেঁ, বুঝ্‌লেন কিনা, ডাক্তারবাবু, সব অদৃষ্ট,—এ—এ—এ—এই যে সব এখানে লেখা (ললাট প্রদর্শন)।

সুধীর। তাই বটে,—তবু আমার অনুরোধে আপনি ছেলে দু'টিকে একবার আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিন্, ওদের উন্নতির জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

মুরলীধর। তা—তা—তা দেখা যাক্। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করি। যদি দু'দিন স্কুলে গিয়ে আর না যায় তবেই যে সব মাটি—হেঁ হেঁ, সব মাটি।

শরৎ। সুধীর, কা'কে বুঝাইতেছ? বুড়া ময়না পোষ মানে?

তার পর সুধীর প্রস্তাব করিলেন, "পরশু আমরা 'পিক্‌-নিক্' ( চড়ি ভাতি ) করিব, স্থির হইয়াছে। উপস্থিত সকলে যোগদান করিলে বিশেষ সুখী হইব।"

রাজেন্দ্র। উহাতে ছাগ-মাংস রন্ধনের আয়োজন হইবে ?

সুধীর। আজ্ঞে হাঁ।

রাজেন্দ্র। তবে তো আমার যাওয়া হইবে না।

শরৎ। কেন, জ্ঞাতি-মাংস বলিয়া আপত্তি আছে না কি ?

আবার হাসির রোল উঠিল। সুধীর কহিলেন, "আমিষ ও নিরামিষের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাইবে। ইহার কোন ব্যতিক্রম হইলে আমি দায়ী।"

তার পর তারিণী বাবু কহিলেন, "রাত্রি বেশী হইল। আজ আসি। কিছু অপরাধ নেবেন না, মল্লিক মশায়।"

মল্লিক মহাশয় করযোড়ে কহিলেন, "বিলক্ষণ! আমি আপনাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না। ভরসা করি, সকল ত্রুটি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন ও মধ্যে মধ্যে একবার পদধূলি দিয়া আমার বাটী পবিত্র করিতে ভুলিবেন না।

বৈঠক ভাঙ্গিল। আগন্তুকগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

## সুধীর ও শরৎ।

সুধীরের সহিত শরতের প্রথমদর্শনাবধি অচ্ছেদ্য প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ে পরস্পরের গুণমুগ্ধ। উভয়েই সতত পরোপকারব্রতপরায়ণ। সৌহার্দ্দ্যের প্রধান উপাদান, হৃদয়ের ঐক্য ও প্রকৃতির সমতা। স্ত্রীপুরুষে মৈত্রী স্বার্থজড়িত, পুরুষদিগের মধ্যে উহা নিঃস্বার্থ ও স্বভাবজ। প্রকৃত বন্ধুত্ব স্বর্গীয় সুখের আকর। সংসারে যাহার একজন অকৃত্রিম বন্ধু আছে তাহার নাই কি? যাহার তাহা নাই, সে মানুষের একটি প্রধান সৌভাগ্যে বঞ্চিত,——বিস্তৃত সহর তাহার নিকট বিশাল অরণ্যতুল্য। প্রিয়তম সুহৃৎ ব্যতীত হৃদয়ের অন্তঃস্থল পাঠ করিতে কে সক্ষম? অভাবে মুক্তহস্ত, সুখে দুঃখে সহানুভূতিকারক, সম্পদে বিপদে চিরসহায়, রোগে ধন্বন্তরি, শোকে শান্তি, শুশ্রূষায় রমণী, হিতোপদেশদানে মন্ত্রী, সদালাপে সভাসদ্, রহস্যে বিদূষক, পিপাসায় বারি, তুফানে কাণ্ডারী, ঔদার্য্যে জলধি, সহিষ্ণুতায় বসুন্ধরা, অতি বিশ্বস্ত

হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ বন্ধু জগতে দুর্লভ। বন্ধু অমূল্য রত্ন। কেশবের কৌস্তুভ, সম্রাটের কোহিনুর, মরুভূমে খণ্ডকুঞ্জ, আকাশে রাকাশশী, সরোবরে শতদল, গিরিমধ্যে হিমাচল, স্রোতস্বতীমধ্যে সুরধুনী, দেশমধ্যে ভারত, নরমধ্যে নরনাথ যেরূপ আদরণীয় বন্ধুও সেইরূপ। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে বন্ধু উজ্জ্বল আলোক; জীবনের শতঝঞ্ঝাবাতে, নিষ্ফলতায়, শোকে, পরাজয়ে, বুদ্ধিভ্রংশে, হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের তাড়িত প্রবাহ ছুটাইতে কেবল বন্ধুই সক্ষম। সুধীর শরতের এইরূপ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে উভয়ের সকল কথা জানিতেন।

একদিন সুধীর শরৎকুমারকে কহিলেন, "দেখ শরৎ, তোমার তো প্রথম হ'তেই বেশ পসার হ'য়েছে। এখন সপরিবারে থাকিতে পার।"

শরৎ। সেদিন বল্‌ছিলে না স্বামিস্ত্রীতে ভাব আদান প্রদানের কথা? সে বিষয়ে আমি বঞ্চিত। তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি প্রণয়হীন পরিণয় করিয়াছি। এর চাইতে বোধ হয় পরিণয়হীন প্রণয় ভাল।

সুধীর। ছি শরৎ, তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিব ভাবি নাই।

শরৎ। শুন সুধীর, আমি বড় ভাগ্যহীন। যখন বিবাহ-সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব বুঝিতে অক্ষম ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন

জানিলাম, একটি অশিক্ষিতা বালিকা আমার জীবনসঙ্গিনী হইলেন। সেই অবধি আমি মৃত—জীবন্মৃত। সেই অবধি যৌবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম-উৎসাহ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমি তো এখন পল্লবহীন ভগ্নশাখ বিটপীর মত, শস্যশূন্য ক্ষেত্রের মত, বারিহীন সরোবরের মত শুষ্ক, অসার। আমি বৃথা এই উদ্দেশ্যবিহীন জীবন বহন করিতেছি, বৃথা এক বালিকার আবেগহীন ভালবাসার বোঝা বহিয়া মরিতেছি।

সুধীর। শরৎ, চেষ্টা করিলে তুমি সুখী হইতে পারিবে। স্ত্রীকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লওনা কেন?

শরৎ। চেষ্টা? চেষ্টা করিয়াছি ঢের। মন একবার ভাঙ্গিলে জোড়া লাগে না। দুটি লোক দুই বিভিন্ন পথে গেলে ক্রমে দূরেই যাইবে। একদিকে ঘোরতর অজ্ঞান ও কুসংস্কার, অপরদিকে জ্ঞানের দিব্য আলোক। আমি চাই শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, প্রেমোন্মাদ,—গৃহিণী করিবেন গোময়লেপন, কোন্দল ও জপতপ। আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই জীবনের চিরসহচরী-রূপে,—মন্ত্রণায় গুরু, কার্য্যে উৎসাহ ও বিপদে অভয়দাত্রী-রূপে,—তিনি ধূলিধূসরিত হইয়া রন্ধনশালার কালিমারঞ্জিত বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া গাত্র হইতে এসেন্স অফ্ চামচিকার গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে আসিবেন ছিন্ন কন্থা সেলাই করিতে, পাঁচী বাগ্‌দিনীর কন্যার 'সাধের' সংবাদ দিতে অথবা শাকচচ্চড়ির

জন্মবৃত্তান্ত এবং 'খাড়া বড়ি থোড়' ও 'থোড় বড়ি খাড়া'র ইতিহাস কহিতে, আর 'শয়নে পদ্মনাভং' স্মরণ করিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে।

সুধীর। তুমি সহধর্ম্মিণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিলে তাহা বড়ই নৈরাশ্যজনক। আর এক দিন বল নাই কি তিনি রূপসী, গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা?

শরৎ। বলিয়াছি বৈ কি? সত্যের খাতিরে এখনও বলিতেছি, তিনি সুরূপা, স্বল্পতুষ্টা, পতিব্রতা। গৃহকার্য্যে তাহার দক্ষতা অতুলনীয়া, স্বামীর যত্ন শুশ্রূষা করিতে তিনি সদা উৎসাহবতী ও শ্রমক্লেশ সহ্য করিতে অকুণ্ঠিতা। তিনি অর্থ, অলঙ্কার, বেশ ভূষা কিছুই চাহেন না। চান শুধু আমাকে। কিন্তু আমি——

সুধীর। কিন্তু তুমি এমনই মূর্খ যে এই স্ত্রীরত্ন চিনিলে না। সংসারের কাজের জন্য গোময়লেপন, ছিন্ন কন্থা সেলাই বা রন্ধন আবশ্যক হইলে কোন্ গুণবতী পত্নীকে তাহা না করিতে হয়? তোমার সহধর্ম্মিণীর অপরাধ, তিনি এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন; তাঁহার দোষ, তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীলা। আমরা তো হতচ্ছাড়া হইয়াছি,—আমাদের দেশের মহিলাগণ ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যকতা কি? তুমি বলিলে, তিনি কোন্দল করেন। আমি যতদূর জানি,

তিনি স্বল্পভাষিণী, শান্তস্বভাবা, প্রসন্নমুখী। এমন গুণবতী পত্নী লাভ করিয়াও যে তুমি সুখী হইতে পারিলে না, ইহা তোমারই দোষ।

শরৎ। শুন সুধীর, সেকেলে ঠাকুরাণীদের মত উঠিতে বসিতে বা পূজাযত্নে আর স্বামী ভুলে না। একালের স্বামী চান গৃহে প্রেম ও রহস্যালাপ, এককথায়, গৃহকে নন্দনকানন করিয়া তুলিতে।

সুধীর। ছি শরৎ, কেবল স্বামী লইয়া প্রণয়সুপ্তিতে মগ্ন থাকা হিন্দুস্ত্রীর আদর্শ নহে। যাহাতে শান্তিপ্রেমসরলতা, আশা-উৎসাহ-উত্তেজনা, ধর্ম্মকর্ম্মসৌভাগ্য, হাসিকৌতুককরুণা, যত্নসেবাশুশ্রূষা, দয়াস্নেহকোমলতা, প্রভৃতির মধুর সম্মিলনে সংসার সুখের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পারে সেইরূপ লক্ষ্য হওয়াই উচিত। শরৎ, তোমার সৌভাগ্য, বিশালাক্ষী তোমার গৃহ পবিত্র করিয়াছেন।

অতঃপর অনেক আলোচনা হইল। আলোচনার ফলে, বিশালাক্ষীকে আনিবার পরামর্শ সাব্যস্ত হইল।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### অনাথাশ্রম।

বাবু রমাপ্রসাদ লাহিড়ীর বাটী শ্রীরামপুরে। কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা বহুকাল হইতে হুগলিতে বাস করিতেছেন। রমাপ্রসাদ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া কোন নেটিভ্ ষ্টেটে পাঁচ বৎসর কাল মাসিক ৭০০৲ সাত শত টাকা বেতনে কার্য্য করেন। সে সময়ে তাঁহার বিধবা জননী পুত্রের নিকটে থাকিতেন। তৎপরে মাতৃবিয়োগ হইলে রমাপ্রসাদ হুগলিতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য সকল বন্দোবস্ত স্থির করেন। তিনি অবিবাহিত। অনেক চেষ্টায়ও কেহ তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। কিন্তু মাকে ফেলিয়া গেলে ধর্ম্মকর্ম্ম নিস্ফল হইবে বিবেচনায় তিনি পাঁচ বৎসর চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

হুগলিতে আসিয়াই রমাপ্রসাদ তাঁহার সকল সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিলেন। দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও আত্মীয়াদিগের ভরণপোষণোপযোগী বিষয় রাখিয়া কেবল নিজের সঞ্চিত

২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা লইয়া কাশীধামে রওনা হইবার ইচ্ছা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যোগাভ্যাস; দ্বিতীয়তঃ, কাশীতে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা। সঙ্কল্পিত কার্য্যে আরও অধিক অর্থের আবশ্যক হইলেও তিনি চাঁদার খাতা লইয়া কাহারও দ্বারস্থ হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি পরের দুঃখে সহানুভূতি করেন, পরসৌভাগ্যে সুখী হয়েন, তিনি দেবতা। রমাপ্রসাদ দেবতা নন তো কি ?

সুধীর ও শরৎ রমাপ্রসাদ বাবুর ইতিহাস মল্লিক মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে কাশী যাইতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাও যথাসময়ে অবগত হইলেন। এরূপ দেবোপম চরিত্র, এরূপ নিঃস্বার্থপরতা, এরূপ মহত্ত্ব, এরূপ ধর্ম্মপরায়ণতা দুর্লভ। সুধীর ও শরৎ রমাপ্রসাদের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার অভীষ্ট বিষয়ে আপনাদের ক্ষুদ্রশক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর একদিন মল্লিক মহাশয় সুধীরকে কহিলেন, "আমার নাম গোপন করিয়া রমাপ্রসাদকে বল,—একটি ভদ্রলোক আপনার প্রস্তাবিত অনাথাশ্রমে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিতে ও মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। যদি দয়া করিয়া আপনি ইহা লইতে সম্মত হয়েন তবে সেই ভদ্রলোক বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন।" মল্লিক

মহাশয় অন্যের করতালি বা 'বাহবা'র প্রত্যাশায় দান করিতেন না। তিনি সঙ্গোপনে ও দম্ভত্যাগ করিয়া সৎকার্য্য করিতেন।

রমাপ্রসাদবাবুর অর্থে ও মল্লিক মহাশয়ের সাহায্যে আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইল। অনাথ ও অনাথাদিগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ভবন ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির হইল। রমাপ্রসাদ কাশীতে যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন ও আশ্রমের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুধীর ও শরতের সামর্থ্য অল্প। কিন্তু তাঁহারা অনাথাশ্রমের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে উৎসাহী ছিলেন।

একদিন সুধীর শরৎকে কহিলেন, "দেখ শরৎ, মুরলীধর বাবু ধনবান। তিনি তো প্রায়ই বলিয়া থাকেন, পরের উপাকারার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন,—তাঁহার নিকট অনাথাশ্রমের জন্য কিছু প্রত্যাশা করা যায় না কি?"

শরৎ কহিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ? পরোপকারের মধ্যে উনি জনকতক আত্মীয়কে কেরাণীগিরি দিয়াছেন। তাহাও নিঃস্বার্থভাবে নহে। আর, এজন্য উনি দিবারাত্রি নিজের বাহাদুরী ঘোষণা করিয়া থাকেন। সুধীর, তুমি মুরলী বাবুর মধুরবচনে প্রতারিত হইয়াছ। উনি জীবনে কখনও পরোপকাররূপ মহাপাতক করেন নাই।

সুধীর। ( সবিস্ময়ে ) সেকি ! উনি মিষ্টবচনে প্রতিশ্রুতি করিতে কখনও তো দ্বিধা বোধ করেন না।

শরৎ। কোন্ কৃপণ সেরূপ নয় ? সর্ব্বদা অঙ্গীকার করা এবং সর্ব্বদা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুরলীবাবুর স্বভাব। জান ত না, উনি একটি ঘুঘু। যাহাতে নিজের কোন স্বার্থ নাই এরূপ কার্য্য তাঁহা হইতে অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত মুরলীবাবু কাহাকেও নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করা দূরে থাক্, তাঁহার বাড়ীর 'পেটেণ্ট' পানের সূক্ষ্ম 'বঁদে' খিলিও নিঃস্বার্থভাবে দেন নাই। যিনি খরচের ভয়ে নিজ কন্যাকে আইবড় করিয়া রাখিয়াছেন, নিরাশ্রয় আতুর বা বৃদ্ধ প্রার্থীকে ভিক্ষা না দিয়া কুলীগিরি করিতে উপদেশ দেন, নিঃস্ব ছাত্র বা উমেদারকে একবেলা অন্ন দেন না, ডাক্তার কবিরাজকে আপনার দারিদ্র্য জ্ঞাপন করিয়া বিনা 'ভিজিটে' রোগী দেখান ও বিনামূল্যে ঔষধ লয়েন, কোনও সৎকার্য্যে কপর্দ্দক দেন না, চাঁদার খাতা দেখিলে অন্দরে প্রবেশ করিয়া অসুখের ভাণ করেন, অথচ স্বকীয়া ও পরকীয়ার সংখ্যা যাঁহার আধ ডজন, সেই কামিনীকাঞ্চন-কীটের নিকট কি আশা করিতে পার ? তুমি বোধ হয় জান না, প্রাতে এই গুণধরের মুখদর্শন ও নামোচ্চারণ বন্ধ হইয়াছে !

সুধীর। বটে, এত দূরই ?—তবে থাক্, উঁহার কথায় আর কাজ নাই।

শরৎ। দেখ সুধীর, আশ্রমের জন্য যা'র তা'র নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করা রমাপ্রসাদ বাবুর ইচ্ছা নয়। কিছু ভাবিও না। ভগবানের কৃপায়, সদুপায়ে অর্জ্জিত স্বেচ্ছাদত্ত অর্থেই আশ্রমের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে।

ঠিক্ কথা। কার্য্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## নূতন বড়লোক।

ইতিমধ্যে নায়েব মহাশয়ের বাটীতে এক চুরি হইয়া গেল। জনরব, দরওয়ানদিগের জ্ঞাতসারে উহা সংঘটিত হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নন্দলাল উমেশের সহায়তায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাতের গোপনে রক্ষিত লক্ষ টাকার মোহর আত্মসাৎ করেন। পরে, নানারূপ আস্ফালন করিয়া অছিলাক্রমে দরওয়ানদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন।

একে এই সকল বিপদ্, তাহার উপর প্রতিবেশিনীগণের নানা প্রকার মর্ম্মান্তিক সমালোচনায় অদম্যহৃদয় কালীতারা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইল। ডাক্তার আসিলেন, কিন্তু তীব্র তিক্ত এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবনে অসম্মত হইয়া কালীতারা নন্দলালকে কহিলেন, "হৈমবতী ডাক্তার ডাক।" হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগিণী ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিলেন। শরীর অনেকটা ভাল হইল। মন ভাল হইল কি? বিপদপরম্পরায় ঘোষ-ঘরণীর দর্প বিশেষরূপে চূর্ণ হইয়াছিল!

এইরূপে কিছুদিন গেল। তৎপরে উমেশ একদিন দিদিকে কহিলেন, "নায়েব মহাশয় যে নোটগুলি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন তাহা ছাতা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, মধ্যে মধ্যে উহা রৌদ্রে দিলে ভাল হইত। ভাগিনেয় এ সম্বন্ধে কি বলেন?"

নন্দলাল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ইহাতে আর দুই মত হইতে পারে? যাহার সামান্য বুদ্ধি আছে সেই-ই এ বিষয়ে মত দিবে। তবে ইহা লইয়া আর দেশশুদ্ধ লোক জানাইয়া কাজ কি? কিন্তু জ্যাঠাইমাকে আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন নোটগুলি স্বহস্তে গণিয়া শুকাইতে দেন ও স্বহস্তে গণিয়া তুলিয়া রাখেন।"

উমেশ নন্দলালের সাবধানতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন ও সংক্ষেপে কহিলেন, "সে ঠিক্ কথা। দিদি তাই করিবেন।"

দুই তিন দিন নোট শুকান হইল। ফলে দেখা গেল, কুড়ি টাকার নোট হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার টাকার নোটগুলি দশ টাকা মূল্যের নোটে পরিণত হইয়াছে এবং জীর্ণ ও অপরিষ্কার নোটের পরিবর্ত্তে নূতন ও পরিষ্কার নোট সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যায় নোটগুলি সমান রহিল। কালীতারা ইহার কিছুই বুঝিলেন না। বরং মনে মনে অত্যন্ত প্রীতা হইলেন।

অতঃপর নন্দলাল প্রস্তাব করিলেন, বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করিয়া পরিশেষে কলিকাতায় বাস করা যাইবে। কালীতারা তাহাতে কতকটা স্বীকৃতা হইলেন। নন্দলাল ভাবিলেন, "একেবারে সব নিঃশেষ করিয়া কাজ নাই। বিষয়গুলি ধীরে ধীরে হস্তগত করিলেই চলিবে। এখন যাহা সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।" অতঃপর তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কালীতারা ও কমলিনী বাটীতে রহিলেন। নন্দলাল সবাহন কলিকাতা রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন।

কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া নন্দলাল দেখিলেন, শ্যামবাজার-নিবাসী তাঁহার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু এক বৃহৎ ত্রিতল বাটী নানারূপে সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার জন্য পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি কক্ষ মূল্যবান্ সরঞ্জামে অলঙ্কৃত। বৈদ্যুতিক আলোক ও বৈদ্যুতিক পাখা এবং সুখবিলাসের বিবিধ সামগ্রীতে সমগ্র হর্ম্ম্য সুশোভিত। তথায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার কোন উপকরণের অপ্রতুলতা ছিল না। পল্লীগ্রামবাসী নন্দলাল ও উমেশ এই নূতন ভবন দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া নন্দলাল মনে মনে কহিলেন, "অর্থের কি মোহিনী শক্তি!"

নন্দলাল এখন সামান্য খট্টার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব পালঙ্কে শয়ন

করেন, সামান্য ভাত-দাইল-সুক্ত-চচ্চড়ির পরিবর্ত্তে পোলাও-কালিয়া-কোর্ম্মা-কাবাব তাঁহার রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তিনি এখন পদব্রজে গমন করেন না, বড় বড় 'ওয়েলার' ঘোটকযুক্ত প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি তাঁহার বায়ু-সেবনার্থে ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি সামান্য বেশে বা অনাবৃত দেহে এখন লোকসমক্ষে আইসেন না, বহুমূল্য নয়নাভিরাম বসনভূষণে তাঁহার কলেবর আচ্ছাদিত থাকে। নন্দলালের গাত্র হইতে সর্ব্বদা নানারূপ সুগন্ধ দশদিক আমোদিত করে। কি জাঁকজমক, কি ঐশ্বর্য্য, কি অকাতর ব্যয়। এতকাল কেহ তাঁহার গুণের আদর করে নাই। আজ স্বগৃহে, পরগৃহে, মজলিসে, বৈঠকে, সভাসমিতিতে, দরবারে, 'লেভি'তে নন্দলালের কি সম্মান, কি সমাদর! সর্ব্বত্র তাঁহার নাম, সর্ব্বত্র তাঁহার যশঃ, সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি, সর্ব্বত্র তিনি বাহবা ও তারিপ্ পাইতেছেন। কেন? এই নূতন সৌভাগ্যের কারণ কি?

নূতন বড়লোকের নূতন বাটীতে অনেক নূতন বন্ধু জুটিতে লাগিলেন। নন্দলাল এখন মধুভাণ্ডবিশেষ। যাচকগণ মক্ষিকার ন্যায়। সকলেই কিঞ্চিৎ মধুর প্রত্যাশায় ভোঁ—ও—ও করিতে করিতে তাঁহার বাটীতে যাইতেছেন। কেহ এক ফোঁটা মধু পাইতেছেন, কেহ মধুভাণ্ডের বাহিরে ঠোকর

খাইয়াই ফিরিয়া আসিতেছেন। আজ নন্দলাল ধন্য, মান্যগণ্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! কেন? কিসের জন্য?

ধন থাকিলেই সমাদর হয়, ধন থাকিলেই জনসমাগম হয়, ধন থাকিলেই প্রার্থীর কলরবে গৃহ মুখরিত হয়। আজ নন্দলাল বিদ্বান্,—কেননা তিনি অর্থশালী। তাঁহার বিদ্যা স্কুল কলেজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; যিনি প্রকৃত শিক্ষিত, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঙ্কিল বর্ত্মে সচরাচর পাদচারণ করেন না, পুস্তকরাশির আবর্জ্জনায় মগ্ন থাকেন না, অপূর্ব্ব গবেষণা ও ভূয়োদর্শনে সুপণ্ডিত হয়েন। নন্দলাল আপনাআপনি গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে জ্ঞান আহরণ করিয়া সুশিক্ষিত হইয়াছেন। কেন? তাহার মূল কারণ, অর্থ। আজ নন্দলাল বুদ্ধিমান্,—কেননা, তিনি ধনবান্। স্বাবলম্বনে এত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এ সংসারে কোন্ মেষাক্ষ স্থূলবুদ্ধি ধনী তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া পরিচিত নহেন? আজ নন্দলাল রূপবান্—কেননা, তাঁহার ধন আছে। এই পৃথিবীতে কোন্ কদাকার কিম্ভূত-মূর্ত্তি স্ত্রীপুরুষ ধন থাকিলে রূপে রতি ও মদন স্বরূপে প্রশংসিত না হইয়া থাকেন? আজ নন্দলাল গুণবান্, মহদাশয়, যশস্বী ও সর্ব্বত্র পূজিত। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে কে তাঁহাকে আজ পরাভব করিতে পারে? উদারতা, মহানুভবতা, ব্যয়শৌণ্ডতার

জন্য তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসিত, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দূর দূরান্তরে বিস্তৃত, তিনি নরপ্রধান, ভাগ্যবান্, লক্ষ্মীবান্ বলিয়া লোকসমাজে পূজিত। কেন? তাহার কারণ, তাঁহার কোষ রজতকাঞ্চনে পরিপূর্ণ। নন্দলালকে কেহ কোনদিন যে সকল গুণের আধার বলিয়া কল্পনা করে নাই, যাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতকাল পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ছিল, আজ সেই নন্দলালের এত গুলি অনাবিষ্কৃত গুণ কেন লোক-নয়নে হঠাৎ প্রতিভাত হইল? তাহার কারণ, যে উপায়েই হউক তিনি এখন অর্থশালী হইয়াছেন। অতিশয় বিদ্বান্, মহাগুণবান্, আদর্শচরিত্র ব্যক্তি নিঃস্ব বলিয়া জনসমাজে অনাদৃত ও অপ্রশংসিত। পক্ষান্তরে, ধনশালী বলিয়া অনেক নরাধম, নরাকার পশু পৃথিবীতে সাধু ও সজ্জন, জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্রূপে পরিগণিত ও পূজিত। হায়, জনসাধারণের স্তুতি বা নিন্দার মূল্য! হায়, সাংসারিকগণের সমালোচনার সারবত্তা! হায়, ধনগৌরব! এই পৃথিবীতে অর্থই মনুষ্যত্বের পরিমাপক। হৃদয়ের উচ্চতা যে ধনের উপর নির্ভর করে না, ইহা কেহ বুঝিয়াও বুঝে না। এ সংসারে যে নির্ধন তাহার কেহ নাই, কিছু নাই,—পদে পদে তাহার দুর্গতি, পদে পদে তাহার লাঞ্ছনা। ধনেই কি সুখ হয়? যাহার অভাব অত্যল্প ও সেই অভাব নিজ পরিশ্রম দ্বারা পূরণ

করিতে সক্ষম, সেই প্রকৃত সুখী। এই হিসাবে একজন দীনহীন কৃষকও ধনকুবের হইতে অধিক সৌভাগ্যশালী ঐশ্বর্য্যের মোহে জগৎ অন্ধ। কাহাকে বুঝাইব, অসদুপায়ে লব্ধ অর্থে ঈশ্বরের অভিসম্পাত আছে, সদুপায়ে অর্জ্জিত কাণাকড়ি কোটি মুদ্রার সমতুল্য?

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

---

## গ্রহের উপগ্রহগণ।

নূতন বড়লোক নন্দলালের প্রাসাদে দিবারাত্রি বহু লোক-সমাগম হইত। তন্মধ্যে প্রধান, বৃদ্ধ ডেপুটি কালেক্টর কেনারাম দে ও দালাল যোগজীবন দত্ত। ডেপুটিপুঙ্গব যেখানে যাইতেন, বাহন বকাউল্লাকে সঙ্গে লইতেন। কেনারামকে কেহ 'ডেপুটিবাবু' কহিলে অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। তাঁহার মেজাজ কড়া, পোষাক ফিরিঙ্গী ধরণের, প্রকৃত আখ্যা 'ডেপুটি সাহেব'। এই 'ডেপুটি সাহেবের' আর এক নাম,—'টিকি কাটা হাকিম'। কারণ, তিনি এ পর্য্যন্ত এক শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়াছেন ও প্রত্যেক টিকি আপনার ঘরে নাম ও নম্বর দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। টিকিগুলির দৈর্ঘ্য ও মূল্য টিকিধারীগণের রুচি ও দাবী অনুসারে বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা পাল্লায় ভারী তাঁহাদিগের ছায়াস্পর্শ করিতে কেনারামের সাহসে কুলায় নাই। তবে সংসারে হাল্‌কা লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। কাজেই, তাঁহার সংগ্রহ মন্দ হয় নাই। 'ডেপুটি সাহেব' টিকিগুলি দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া-

ছিলেন। প্রথম, উপাধিধারী পণ্ডিতদিগের; দ্বিতীয়, পুরোহিতগণের। অনেক অর্থব্যয় করিয়া প্রথম শ্রেণীর দশটি টিকি সংগৃহীত হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকি নব্বুইটী।

এই 'ডেপুটি সাহেব' বয়োবৃদ্ধ হইলেও পুত্রের তুল্য বয়স্ক নন্দলাল ও উমেশের সহিত ইয়ারকি দিতে এবং মাতলামি করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বলা বাহুল্য, গুণধর নন্দ ও উমেশ কলিকাতায় উপযুক্ত সঙ্গিলাভের পরেই বোতল ধরিয়াছিলেন।

কেনারামের এক অভ্যাস ছিল, সর্ব্বত্র তাঁহার নামের মানে বুঝানো। নন্দলাল-ভবনেও তিনি একদিন বলিতে ছিলেন, "আমার নাম ইংরেজিতে মিষ্টার্ কেনার‍্যাম ডে। আমার মনিব ছিলেন, ম্যাক্‌কেনা সাহেব। দৈবে তাঁহার নামের শেষাংশ আমার নামের প্রথম কথাটির সহিত মিলে। আমি তাই বুঝাইয়া সাহেবকে বড় খুসী করি। তার পর থেকে আমি তাঁর কেমন সুনজরে পড়ি। সেই হ'তে আমার উন্নতির সূত্রপাত ও কেরাণী কেনারাম পাঁচ শো টাকা মাইনের 'ডেপুটি সাহেব' পর্য্যন্ত হইয়াছেন! (কাসি) আমার নামের দ্বিতীয় কথাটি, 'র‍্যাম'। ইংরেজিতে 'র‍্যাম' মানে ভেড়া। (সকলের হাস্য) উহাতে হাসিবার কিছু নাই। কত সাহেবের 'ফক্স্', 'হগ্', 'ক্রো' নাম আছে। নামে কি যায়

আসে? 'গোলাপ যে নামে ডাক সুগন্ধ বিতরে'। সাহেবিয়ানার জন্য কেবল 'রাম' কেন, 'রামছাগল' পর্য্যন্ত হ'তে রাজি আছি। আর দেখ, আমার নামের শেষ কথা, যা'কে তোমরা পদবী বল,—'ডে'। বকাউল্লা, 'ডে' মানে জানিস্?"

বকা। (করযোড়ে) আজ্ঞে, হুজুর সা'ব্, 'ডে' মানে 'দিন'।

জনৈক ভদ্রলোক। কেমন তৈ'রি প্রিয়বয়স্য!

কেনারাম। ওকে আমিই তৈয়ার করিয়াছি। সে যা' হোক্, এখন শুনুন। 'ডে' মানে দিন,—পরিষ্কার, উজ্জ্বল দিন। আমার নামের শেষে 'ডে' আছে,—কেননা, আমি ডেপুটিকুলের উজ্জ্বল রত্ন।

এমন সময়ে স্থূলকায় 'ছি, ছি, স্যাণ্ডেল্' (চারুচন্দ্র স্যান্যাল) ও 'মিষ্টার্ হ্যারি ডস্ পল' (হরিদাস পাল) তথায় সমুপস্থিত হইলেন ও 'হ্যালো', 'হ্যালো' করিতে করিতে সজোরে কেনারাম, নন্দলাল ও উমেশের করমর্দ্দন করিলেন। বিষম করপীড়ন হইতে তাঁহারা কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিলেন।

তারপর আসিল সাদা ও লাল জলের রকমারি বোতল। সঙ্গে সঙ্গে মধুর ঠুন্-ঠুন্ বক্-বক্ ঢুক্-ঢুক্ শব্দে সুরাদেবী নির্জ্জন কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া ডিক্যান্টারে বিরাজ

করিলেন এবং ডিক্যাণ্টার হইতে গ্লাসে অবতরণ করিয়া উলটি পালটি খাইতে খাইতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখচুম্বন করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ইহার পরই দালাল যোগজীবন বাইজী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। বাইজী কিছুক্ষণ পরেই সেঁইয়া-বেঁইয়ার গান ধরিলেন। ওস্তাদজী অনেক অঙ্গভঙ্গী সহকারে তান-লয়-সংযোগে সারেঙ্গ্ বাজাইতে লাগিলেন ও তবলচি নানা করতপের সহিত বাঁয়াতবলায় হাতযশ দেখাইতে প্রয়াস করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর নাচ—সঙ্গে সঙ্গে শত 'বাহবা' ও 'বলিহারি'র ধূম পড়িয়া গেল।

গান থামিলে যোগজীবন নন্দলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজা বাবু, কলিকাতার সকলেই আপনাকে ধন্য ধন্য কর্‌চে। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে আপনার নাম।

নন্দলাল। বটে ?

যোগজীবন। না হ'বে কেন ? এই উড়ু-উড়ু কর্‌চে যৌবন, 'ঢলে' পড়ে' 'ঢলে' পড়ে' মত চলন, 'মেরে ফেল' 'মেরে ফেল' গোছের চাহনি, পাকা চাঁপা কলার মত রং, দিব্যি একহারা গড়ন, আর তার উপর অতুল ধন ও প্রভুত্ব। এর একটিতেই রক্ষা নেই,—আপনাকে দেখ্‌চি এর সবগুলিই আছে। বলেন কি, লোকে আপনাকে তারিপ্

করবে না? আপনি হ'বেন একজন খেলোয়াড়, দলের কাপ্তেন। আপনি যদি প্রজাপতির মত স্ফূর্ত্তি ক'রে এ ফুলে ও ফুলে না বস্‌বেন তো বস্‌বে কে?

চারিদিক হইতে ইয়ারগণ সমস্বরে কহিলেন, "তোফা,—ঠিক্ বলেছ, বাবা,—ঠিক্ বলেছ।" কিন্তু মিষ্টার পল্ অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "প্রজাপতি-থেকো পাখীও কম উড়্‌চে না।"

আবার সুরা আসিল—আবার সেই প্রাণভুলানো মন-মাতানো ঠুন্-ঠুন্ বক্-বক্ ঢুক্-ঢুক্ শব্দ—আবার গান—আবার নাচ। নন্দলাল আপনাহারা, উমেশচন্দ্র সংজ্ঞাহীন।

মেসার্স কেনারাম ও স্যাণ্ডেল্ কোমর দুলাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দলাল অর্দ্ধমুদিত-নয়নে এক একবার 'বাহবা', 'বাহবা বাবা', 'মরে যাই' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রসিকতার চেষ্টায় কেনারাম মাঝে মাঝে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলেন। যোগজীবন তাহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন, "কেনারাম বাবু, পার্শ্বে ভদ্রলোকের বাড়ী আছে। জিহ্বা একটুকু সংযত করুন।" চীৎকার করিয়া ডেপুটিপ্রবর কহিলেন, "কোন্ শালা আমাকে 'কেনা-রাম বাবু' বলে? মিষ্টার্ ডে বল, মিষ্টার্ ডে বল।"

মিঃ পল্। মাতাল হ'য়ে মনে কর্‌চো, সব বল্‌তে পার। তা' মুখ দিয়ে শালা কথাটির বদলে ভুলেও কি একবার

'বোনাই' শব্দটি বা'হ্ন হয় না, বাবা? সে বেলা তো দেখ্‌ছি জ্ঞানের নাড়ী বেশ্ টন্‌টনে্।

কেনারাম। অল্ রাইট্, আর বাবু ব'লো না। এবারে 'কম্প্রোমাইস্', অর্থাৎ কি না, আপোষ করা যা'ক্। নিয়ে এস বোতল। বোতলই হচ্ছে আমাদের মিলন-ক্ষেত্র।

পুনরপি ঢুক্-ঢুক্-ঢুক্। তার পরই এপাশ ওপাশ হইতে ওয়াক্—ওয়াক্—ওয়াক্-থু শব্দ উত্থিত হইল। তখন বাইজীর গান থামিল। তিনি ওস্তাদজী ও তবলচির সহিত প্রস্থান করিলেন। পিছনে পিছনে গেলেন, চতুর যোগজীবন। বাইজীরও যাওয়া, নন্দলালেরও গান ধরা,—"আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দেখগো পলায়", "আমার মন কেড়ে নিয়ে দেখগো পলায়।" তারপর ডেপুটি কেনারাম টলিতে টলিতে বকাউল্লা সহ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু কয়দিন?

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—⊷○⊶—

### সমস্যাপূরণ।

জগতে পাপ আছে বলিয়া পুণ্যের চিত্র এত মনোহর। দুঃখের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা আছে বলিয়া সুখের মাদকতা এত তীব্র।

নন্দলাল-ভবনে সুরাপায়িগণ যখন উন্মত্ত কোলাহল করিতেছিলেন তখন অন্যত্র ভিন্নরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। রমা-প্রসাদ পত্রে জানাইয়াছেন, সুধীর বা শরতের মধ্যে যে কেহ অনাথাশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অবিলম্বে কাশী আসিলে বিশেষ সুবিধা হয়। কেননা, তাঁহার একার পক্ষে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা কঠিন। আপাততঃ একমাস সাহায্য করিলেই চলিবে।

সুধীর ও শরৎ উভয়েই কাশী যাইতে সমুৎসুক। সুধীর কহিতেছেন, "দেখ শরৎ, তোমার যেরূপ পশার তাহাতে এক-মাস হুগলিতে না থাকিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। আর, মুন্সেফ বেচারাম বাবু বহুমূত্র পীড়ায় সাঙ্ঘাতিক কাতর। তোমার উপর তাঁহার যেরূপ আস্থা তাহাতে এমন অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া গেলে কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না।"

শরৎ। আমি কোনও বিচক্ষণ চিকিৎসককে তাঁহার ভার দিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে না। অনাথাশ্রমের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা এক গুরুতর কর্ত্তব্য। কেবল আপনার উদরপূর্ত্তির জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকা মনুষ্যোচিত নয়।

সুধীর। আমি যদি এখানে না থাকিতাম, তবে ইহা একটি সমস্যার বিষয় হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি গেলে সকল দিক বজায় থাকে। এমতাবস্থায় কাহার যাওয়া সঙ্গত তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

শরৎ। তুমি গেলে ক্ষতি আরও বেশী। প্রথমতঃ, তোমার পাঠের ক্ষতি এবং এইরূপে অনর্থক কতকগুলি 'ল-লেক্‌চার' নষ্ট করিলে আবশ্যকীয় 'পার্‌সেণ্টেজ' না থাকার বিশেষ আশঙ্কা। পরীক্ষা দিতে না পারা অত্যন্ত গুরুতর কথা। দ্বিতীয়তঃ, স্কুলের সমূহ ক্ষতি হইবে। তৃতীয়তঃ, মল্লিক মহাশয়ের পৌত্রদ্বয়ের শিক্ষায় একটা অতর্কিত বাধা পড়িবে।

সুধীর। শরৎ, আমি বরাবর 'রেগুলার'। 'ল-ক্লাসে' একমাস অনুপস্থিতি বিপজ্জনক হইবে না। একমাস না পড়িলে পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। স্কুলের বন্দোবস্তও একটা জটিল সমস্যা নয়। আর, আমার পরিবর্ত্তে কোন যোগ্য প্রাইভেট টিউটর মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র দুটিকে এক মাস পড়াইলে কোন ক্ষতি হইবে না। শুন শরৎ, আমি

দরিদ্র। অর্থ দ্বারা অনাথাশ্রমের কার্য্যে সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি অন্য উপায়ে মহাত্মা রমাপ্রসাদের আরব্ধ কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করিতে পারি, তবে সে সৌভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

শরৎও এই সুযোগ ছাড়িতে অসম্মত। কাজেই দ্বন্দ্ব এইরূপ অপ্রতিহতভাবেই চলিতে লাগিল। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মুন্সেফ বাবু ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়াছেন। আজ তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ।"

সুধীর কহিলেন, "দেখ শরৎ, দৈব আমার অনুকূল। আর আপত্তি করিও না।"

শরৎ। তবে যাও, সুধীর! এই পাশ-বহিতে যে সামান্য সঞ্চিত ধন আছে, তাহা আশ্রমের কার্য্যে ব্যয় করিয়া আমাকে সুখী করিতে ভুলিও না।

সুধীর দেখিলেন, শরৎ বাড়ী করিবেন বলিয়া সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিলেন তাহা অম্লানবদনে অর্পণ করিলেন।

একদিকে নন্দলাল ও তাঁহার উপগ্রহগণের স্বার্থ, বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরদিকে সুধীর ও শরতের ত্যাগস্বীকার! একদিকে পাপের আবিল স্রোত, অপরদিকে পুণ্যের পূত প্রবাহ!

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### এক পেয়ালা চা।

বাবু বেচারাম চক্রবর্ত্তী অ্যাডিসনাল্ মুন্সেফ। প্রমোশন না পাইয়া ও উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের নিকট তাড়া খাইয়া তাঁহার মেজাজ কিঞ্চিৎ কর্কশ হইয়াছিল। ভদ্রব্যবহার কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। বিচারাসনে বসিলে তাঁহাকে ঠিক পেচকের ন্যায় দেখাইত। তাঁহার মুখমণ্ডলে হাসির ক্ষীণ রেখাও প্রতিভাত হইত না। এই পৃথিবীতে অনেকে নিজের দুঃখের বোঝা লইয়া অপরকে অসুখী করিতে নিয়ত সচেষ্ট, নিজে হাসিতে না জানিয়া অন্যের হাসি স্ফূর্ত্তি বিনাশ করিতে সতত প্রয়াসী। তাহারা বুঝে না, হাসি বিমল স্বর্গীয় সুধা, বিমর্ষতা নরকের তীব্র হলাহল।

মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী প্রসন্নময়ী সর্ব্বত্র প্রশংসিতা আদর্শ গৃহিণী। কন্যা সুহাসিনী মাতার অনেক গুণ অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুহাসিনী গৌরাঙ্গী। পূর্ণস্বাস্থ্যে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছিল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ হইলেও তিনি অবিবাহিতা। হারমোনিয়াম-

সহযোগে সুললিতকণ্ঠে গান গাহিতে সুহাসিনী বিশেষ দক্ষা। বেচারাম বাবুর একটি ছেলে ছিল। সে বিদ্যাবুদ্ধিহীন। মুন্সেফ বাবু ভাবিতেন, "হায় সুহাসিনী যদি আমার ছেলে হইত!"

মুন্সেফ বাবুর বাটীতে তাঁহার ভাগিনেয়ী মালতী বাস করিতেন। মালতী বালবিধবা। তাঁহার কথা পরে বলিব।

শরৎকুমারের সুচিকিৎসায় মুন্সেফ বেচারাম ডাক্তার বাবুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত হইলেন এবং স্বাভাবিক কার্পণ্যদোষের মাত্রা কিঞ্চিৎ কমাইয়া প্রায়ই সকালে বা সন্ধ্যায় তাঁহাকে চা ও জলখাবার দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। চা-দাত্রী সুহাসিনী। তিনি চা ও জলখাবার লইয়া শরতের খাওয়ার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন। 'আজ ক্ষিদে নেই' বলিয়াও শরৎ নিষ্কৃতি পাইতেন না। বালিকা জিদ্ ধরিতেন, "এগুলি আপনাকে খেতেই হ'বে।" রূপসীর অনুরোধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? শরৎ ভাবিলেন, 'ভদ্রলোকের অনুরোধে ঢেঁকি পর্য্যন্ত খাইবার ব্যবস্থা আছে; আর, রমণীর অনুরোধে দু'টা সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া যায় না?" বুদ্ধিমান শরৎ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রেকাবি খালি করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কোন কোন দিন তিনি সুহাসিনীকে কহিতেন, "আজ তুমিই খাও না।" সুহাসিনী কহিতেন, "তাই ত, আমার জন্যেই এসব এনেছি!" বেচারা শরৎ কি

করিবেন? ইহার উপর তাঁহার আর কোন জারিজুরি খাটিত না। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই সুহাসিনী ধর্ম্মমূলক গান গাহিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর হারমোনিয়ামের সহিত মিশিয়া শরতের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত। গান শুনিয়া শরৎ কহিতেন, "সুহাসিনি, তোমার কি সুন্দর গলা, এমন মিষ্টি গান আমি কখনও শুনি নাই।" দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল, শরৎ যখনই আসেন সুহাসিনী তখনই ছুটিয়া বাহিরে আইসেন ও অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকেন। আবার চারি চক্ষু একত্র হইলেই লজ্জায় বালিকার চক্ষু অবনত হইত।

সুহাসিনী শরৎকে যেই প্রথম দেখিয়াছিলেন, অমনি মজিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনে প্রেম বড় তীব্র। শরতের যাতায়াত যতই বাড়িতে লাগিল, সুহাসিনী তাঁহার প্রতি ততই অনুরক্তা হইতেছিলেন। এদিকে ডাক্তারেরও চা'য়ে বেশ মৌতাত ধরিল। একখানি কমনীয় হস্তে এক পেয়ালা চা পাইবার প্রলোভন সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই অসাধ্য হইয়া উঠিল।

শরৎ আসিতে দেরী করিলে সুহাসিনী অস্থির হইতেন। তিনি সর্ব্বদা শরৎকে কাছে রাখিতে চান। কেননা, ভালবাসা বিচ্ছেদ সহিতে পারে না। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে লতার মত জড়াইয়া থাকিতে চায়। ইহাতে

পরমুখাপেক্ষা ও বশ্যতা বিদ্যমান,—পরস্পরের গুণোপলব্ধি ইহার কার্য্য,—আদর-সোহাগ-মান-অভিমান ইহার উপকরণ, এবং চুম্বন-আলিঙ্গন-অশ্রুবর্ষণ ইহার উদ্দীপনার কারণ। ভালবাসার আধিপত্য যত বাড়িতে থাকে, এই সকল লক্ষণও ততই সুস্পষ্ট হয়। শরৎ সুহাসিনীতেও তাহাই হইল। সংসারানভিজ্ঞা বালিকা সুখের মোহে বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার হৃদয় একেবারে হারাইয়াছে, আর ফিরিবার পথ নাই। তিনি ক্রমে শরতের সহিত আপনার ব্যবধান কমাইয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, যুবককে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লয়েন। সুহাসিনী জানিতেন না, শরৎকুমার বিবাহিত।

চুম্বকে আকৃষ্ট হইলে লৌহ কতক্ষণ স্থির থাকিবে? আসন্নযৌবনা রমণীর আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এরূপ পুরুষ বিরল। ভালবাসার উত্তাপে কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়। শরতের হৃদয় তো কোমল! সুহাসিনীর ভাবভঙ্গী, চকিত চাহনি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, বালিকা দুরাশার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। হৃদয়ে হৃদয়ে যে তাড়িতপ্রবাহ ছুটে, তাহা কে কতদিন না বুঝিয়া থাকিতে পারে?

প্রসন্নময়ী দেখিলেন, বালিকা দিন দিন কেমন যেন হইয়া যাইতেছে। ভাল খায় দায় না। সারাদিন কি যেন ভাবে ও ছাইভস্ম লিখে। তিনি স্বামীকে কহিলেন, "একবার

ডাক্তার বাবুকে দেখাইলে হয় না? সুহাসিনী যে শুকাইয়া গেল।” হায়, এ রোগ বিষম। ইহা যাহাকে একবার ধরিয়াছে, সে জীবিতেশ সম্মিলনের পূর্ব্বে ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। প্রসন্নময়ীর ইচ্ছা, ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেন। ব্যাপার মন্দ নয়। তিনি যে এখন নিজেই রোগগ্রস্ত!

শরতের মনে কর্ত্তব্যের সহিত প্রেমের প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। একদিকে বিশালাক্ষীর প্রতি কর্ত্তব্য, অপর দিকে সুহাসিনীর প্রেমের আকর্ষণ। শরৎ কি করিবেন? কর্ত্তব্য কহিল, “বিশালাক্ষী তোমার ধর্ম্মপত্নী। তাঁহাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া তুমি কখনও সুখী হইতে পারিবে না। বিশালাক্ষীর মত স্ত্রী কজনার আছে? তিনি যে তোমার মনের মত হইতে পারেন নাই, সে দোষ কাহার? নাটকের প্রেম যদি তোমার পছন্দ হয়, তেমনি করিয়া বিশালাক্ষীকে গড়িয়া লও না কেন? আর, প্রণয়ের অভিনয়েই কি প্রকৃত সুখ? সাধ্বী স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া সুখী হও।”

প্রেম কহিল, “ভাল রে বাপু, গড়িয়া পিটিয়া কি প্রেম হয়? চেষ্টা করিয়া তিক্ত ঔষধ গেলান যায়; কিন্তু, প্রেম সেরূপে গেলান যায় না। একটা অরসিকা ছুঁড়ীর জন্য বেচারা বুঝি জাহান্নামে যা’বে ও চিরটা কাল কষ্টে কাটাইবে? পরামর্শ মন্দ নয়। শরৎ যদি সুহাসিনীকে ভাল বাসিতে

না পারে তবে কি সে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া চিরকাল কেবল ধর্ম্মপত্নীতে অনুরক্ত থাকিবে? শরতের উপর কাহারও মৌরসী স্বত্ব নাই। তাহার প্রাণ যদি খালি পড়িয়া থাকে তবে সে তাহা কেন না ইজারা দিবে? ইহাতে দোষ কি? বিবাহ হইলেই প্রেম জন্মে না। কেবল একত্র অবস্থান বাদে প্রেমের জন্য আরও কিছু চাই। তাহা, প্রাণে প্রাণের সাড়া বুঝা। বিশালাক্ষীর দ্বারা উহা অসম্ভব। সুহাসিনী শরতের জন্য পাগলিনী। নবযৌবনার এই অপার্থিব প্রণয়সুধা প্রত্যাখ্যান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?"

কর্ত্তব্য পুনরপি কহিল, "শরৎ, এখনও ফের! জগতের চক্ষে, ঈশ্বরের, চক্ষে, তুমি খাটো হইও না। বিশালাক্ষীর মনে কষ্ট দিও না।"

কিন্তু প্রেম ক্রমেই শরতের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। শরৎ উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। মস্তিষ্ক পুরুষ, হৃদয় স্ত্রী। অভিজ্ঞ সংসারীকে কি বুঝাইতে হইবে, স্ত্রী যে জিদ্ ধরেন, পুরুষ তাহাই করিতে বাধ্য হয়েন? হৃদয় যদি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, মস্তিষ্কের সাধ্য কি সে বিষয় হইতে কাহাকেও নিরস্ত করে? শরৎ মজিলেন। প্রেমের জোয়ারে বিচারশক্তিতে ভাটা পড়িল। তবু যেন কে তাঁহার কাণে কাণে কহিতে লাগিল, "শরৎ, ফের—ফের—ফের!"

হায় পুরুষ! তোমার সকল বিদ্যা, সকল দম্ভ, সকল আস্ফালন, দুইটি ঢলঢল চক্ষুর নিকট চূর্ণ হয়। তোমার পৌরুষের বড়াইও যেমন অধিক, নিস্ফলতাও তেমনি চূড়ান্ত। ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সামান্যা বালিকার নিকটও পুরুষ পরাজিত। যুবতীর নিকট তো বন্দী।
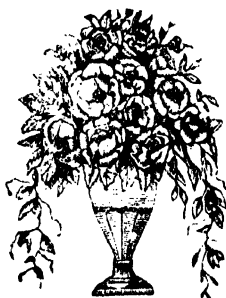
# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

## বালবিধবা।

শরৎ বালিকাকে প্রতারণা করা অনুচিত বোধে স্থির করিলেন, সুহাসিনীকে স্পষ্টই বলিবেন, তিনি বিবাহিত। অতএব এই প্রণয়ের অভিনয়ে এখন যবনিকা পতন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পরস্পর দেখা হইলে শরৎ বলি' বলি' করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। কেননা, সুহাসিনীর কটাক্ষে এমন এক মাদকতা ছিল যে তাহাতে তিনি আত্মহারা হইলেন। শরৎ ভাবিলেন, "বালিকার মনে ব্যথা দিয়া কাজ নাই।" কাজেই তিনি অবাধ প্রণয়-স্রোতে গা ভাসাইলেন।

শরৎসুহাসিনীর প্রেম ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সুহাসিনী পরে জানিতে পারিলেন, শরৎকে স্বামীরূপে পাইবার প্রত্যাশা নিশার স্বপ্নের মত। তিনি ভাবিলেন, "কেন ইঁহাকে দেখিলাম? দেখিলাম তো মজিলাম কেন? মজিলাম তো পাইলাম না কেন? শরৎ, প্রাণের শরৎ, তুমি আমার হইবে না?" সুহাসিনী শরৎকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন।

তবু ভুলিতে পারিলেন না। বরং প্রেমের তুফানে হাবুড়ুবু খাইতে লাগিলেন। কেননা, প্রেমে সুখ আছে।

আড়াল হইতে শরৎসুহাসিনীর প্রেমাভিনয় দেখিয়া মনাগুনে পুড়িয়া মরিতেন, বালবিধবা মালতী। নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হইতে বঞ্চিতা হইয়া তিনি অপরকে সেই সুখের অধিকারিণী দেখিলে বিশেষ দুঃখিতা হইতেন। অন্যের হাসি-কৌতুক তাঁহাকে যেন বিদ্রূপ করিত। সুহাসিনীর আনন্দ দেখিলে তিনি ভাবিতেন, "বালিকা ঐরূপ হাসি, ঐরূপ সৌভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে।" এক কথায়, মালতী সুহাসিনীর প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

মালতীর চক্ষু ভাষাময়, চুল অবেণীবদ্ধ, পরণে সাড়ী; হঠাৎ দেখিলে সধবা বলিয়া ভ্রম হইত। সংসারে গঠন সুন্দর ও স্বভাব সুন্দর এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিরই আদর অধিক। সুন্দর গঠনের ভিতর কুৎসিত মন কুসুমের অন্তরালে ভুজঙ্গের ন্যায় মারাত্মক। মালতীর ভিতরটা বড় ময়লা।

তিনি ভাবিলেন, "সকলে বলে আমি রূপসী। কিন্তু শরৎ যদি সে রূপের আদর না করিল, তবে এ পোড়া রূপ দিয়া কি করিব? হায়, বিধবার রূপ! অদৃষ্টে যদি কষ্ট লেখা ছিল, তবে কেন, বিধি, এত রূপ দিলে? রূপ দিলে তো অভাগিনীর সর্ব্বনাশের জন্য কেন এই পূর্ণযৌবন পাঠাইলে?

প্রাণে কেন আকুল প্রেমতৃষ্ণা জাগাইলে? মনের সাধ মিটাইতে পারিব না তো কেন মিছে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মনাগুনে পুড়াইতেছ?" শোকাবেগে মালতীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ, মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দুগুলি তাঁহার কঠিন উন্নত পীবর কুচকুম্ভে আঘাত পাইয়া চূর্ণ হইতে লাগিল।

সকলেই যে বৈধব্যের পূর্ণ আদর্শে উপনীত হইতে পারেন, এমন কথা বলিতে আমরা সাহসী নহি। ভগবান্ সকলকে এক ছাঁচে গড়েন নাই। কেহ প্রলোভনজয়ে সমর্থ, কেহ অসমর্থ। কাহারও লক্ষ্য, বাসনাদমন;—কাহারও, সুখ-লালসা। চরিত্রের বৈচিত্র্যই সৃষ্টির বিশেষত্ব। এ সংসারে নিত্য দেখিতে পাই, নানা মানুষ, নানা মুখ, নানা লক্ষ্য, নানা স্বভাব।

মালতীর প্রাণে যে অপূর্ণ প্রেমপ্রবাহ এতদিন ফল্গু নদীর ন্যায় বহিতেছিল তাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মালতী আত্মহারা হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "শৈশবে কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহা মনে নাই। যাঁহার হাতে পড়িয়াছিলাম, তাঁহাকে তো হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের পূর্ব্বেই হারাইয়াছি। তবে কেন আমার জীবন শ্মশান করিব? এই অনাস্বাদিত সুখ কেন ভোগ করিব না?" প্রেমের পবিত্রস্পর্শে মানবী দেবী হয়, লালসার স্পর্শে দানবী হয়। বলিতে হইবে

কি, মালতীর হৃদয়ে যে বহ্নি জ্বলিয়াছে তাহা প্রেম নয়, লালসা?

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। তবু দিন যায় না। মালতীর উপায় কি? হয় শরৎ,—নহিলে, কলসী দড়ি-সহযোগে।

ইতিমধ্যে একদিন সুহাসিনীর জ্বর হইল। ডাক্তার বাবু পীড়া নির্ণয় করিয়া কহিলেন, "ব্রণ্কাইটিসের সঙ্গে অবিরাম জ্বর।" মালতী ভাবিলেন, "এই আমার শ্রেষ্ঠ অবসর। এই সময় সেবায় ও রূপে শরৎকে মুগ্ধ করিয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে, চার ফেলিয়া মাছ ধরিতে হইবে, ফাঁদ পাতিয়া প্রাণের পাখী ধরিতে হইবে, ধরিয়া হৃদয়পিঞ্জরে রাখিতে হইবে। সুহাসিনী বালিকা। সে প্রেমের কি বুঝে? শরৎ নির্ব্বোধ। ছিঃ, বালিকার সঙ্গে প্রণয় সম্ভবে? দেখিব, যৌবন ও কৈশোরের দ্বন্দ্বে কাহার পরাজয় হয়? ডাক্তার বলিয়াছেন, 'বরণকাটি' (ব্রণ্কাইটিস্) রোগ। কেন, 'নীলমণি' (নিউমোনিয়া) ধর্‌তে পার্‌লে না গো? 'মুন্সীপালের' (মিউনিসিপ্যালিটির) এলাকায় 'পেলেগ' কি নেই গো? এই মানুষখেকো ডাইনী-টাকে 'বেহ্মদত্যি'তে পায় না গো?"

সুহাসিনীর পীড়াকালে মালতী মূল্যবান্ গরদ পরিয়া ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া এলোচুলে শরতের জন্য জলখাবার লইয়া আসি-

তেন। কিন্তু তাহা শরতের মুখে রুচিত না। প্রসন্নময়ী বিশালাক্ষীর নিকট থাকিতেন। খাবার দিয়া মালতী ভাবিতেন, "ভাল জ্বালা, এত যত্ন করিয়া খাবারগুলি দিলাম, চিক্কণ গরদ পরিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরৎ মুখ নীচু করিয়া খাইতেছে। মিন্সে কি চোখের মাথা খেয়েছে? মুখ তুলে কি একবারও দেখ্‌বি নে? দেখ্‌লে বুঝ্‌তিস্ তোর সুহাসিনী মালতীর পায়ের কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য নয়। হয়ত, শরতের অন্তরালে তাকাইবার অভ্যাস নেই। আমি যে অন্তরালে আছি সরলমতি যুবক যদি তাহা না জানে? আর, যদি সে জানিয়াও না জানে? তবে?—তবে তো আমি মরিয়াছি। তবে শরৎ নির্ব্বোধ। ক্রমে আমাকেই দেখ্‌চি আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। যা'ক্ আর কালক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ যদি অবসর দিয়াছেন, তবে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই সঙ্গত। দিই বার কতক কাসি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মালতী কয়েকবার কাসিলেন। বলা বাহুল্য, শরৎ নতমুখে খাইয়া উঠিলেন। মালতী দেখিলেন, 'এ সহজে বাগ মানিবে না। বড় লাজুক-স্বভাব। এমন বোকা সাজ্‌লে কি প্রেম করা চলে? আমরা নারীজাতি। আমরা দিব ধরা, ধর্‌বি তোরা। তা' নয়, আমার শেষটা নির্লজ্জা নাম রটাবি? বিধি তোকে পুরুষ করে' যদি গ'ড়েছে, তবে তোর মনটা কেন মেয়েলী ধরণের হ'ল?'

এইরূপে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। মালতী অনেক ভাবিলেন; ভাবিয়া স্থির করিলেন, আত্ম-প্রকাশ ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। এক দিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আসিলেন। বেচারাম বাবু তখনও আদালত হইতে ফিরেন নাই। সুহাসিনী কিছুতেই প্রসন্নময়ীকে কাছছাড়া হইতে দিতেন না। মালতী দর্পণে মুখ দেখিয়া তাহাতে কটাক্ষ বৃষ্টি করিয়া উহার শক্তি পরীক্ষা করিলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় ডাক্তার বাবুকে জলখাবার দিতে গেলেন। তাঁহার কাণের দুল থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার গণ্ড চুম্বন করিতে লাগিল, মুক্তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং সাড়ীখানি পীন-পয়োধর ক্ষীণ কটি, গুরুনিতম্ব ও রম্ভোরুদ্বয় পীড়ন করিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন মালতীর হৃদয়ে আশানৈরাশ্যের প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। আহারান্তে শরৎ মুখ ধুইয়া বাহিরের কক্ষে গেলেন। মালতী কম্পিতপদে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পান দিলেন ও ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "ডাক্তার বাবু, আর কত দিন আমায় নিরাশ করিবেন?"

চমকিত হইয়া শরৎকুমার কহিলেন, "সে কি? কি হই-য়াছে বলুন।"

উত্তেজিতস্বরে মালতী কহিলেন, "কি হইয়াছে জান না? হইবার আরও কি বাকী আছে? আমার হৃদয়ের একমাত্র

আশা, একমাত্র সাধ বিনষ্ট করিয়াছ। তবু জিজ্ঞাসা করিতেছ, কি হইয়াছে ? হায়, নির্ম্মম পুরুষজাতি! তোমাদের ছলনায় কত রমণী দিবানিশি প্রতারিত হইতেছে ; তোমরা করিবে বঞ্চনা, আমরা সহিব যন্ত্রণা!"

শরৎ। সে কি! আপনাকে তো আমি কখনও——

মালতী। কখনও ছলনা কর নাই ? তবে কেন আমার নয়নপথে আসিলে ? প্রেমের দিব্য আলোকে কেন এই দুঃখিনী অবলার চক্ষু ঝলসিয়া দিলে ? শুন শরৎকুমার, আমি বাল-বিধবা। এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষকে এই ক্ষুদ্র হৃদয় সমর্পণ করি নাই। কিন্তু তুমি—জানি না কেমন করিয়া—তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, কেমন করিয়া আমায় পাগল করিয়াছ! শরৎ, প্রাণের শরৎ, মালতী তোমার প্রেমে উন্মাদিনী!

শরৎ। আমার অনুরোধ একবার প্রকৃতিস্থ হইয়া শুনুন ;—আমি আপনার প্রতি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছি, আমার বোধ হয়, আপনি তাহাকেই প্রণয় অনুমান করিয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছেন। অনুগ্রহ করিয়া আমায় ওরূপভাবে আর সম্ভাষণ করিবেন না।

মালতী। শরৎ, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব শরৎ, আর যন্ত্রণা দিও না—তোমার প্রতি কথা আমার কাণে মধুবর্ষণ করি-

তেছে। তোমার উপেক্ষা আমাকে তোমার জন্য আরও পাগল করিতেছে। তোমায় দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতৃপ্ত আকুল বাসনা জাগিয়া উঠিতেছে।

"তবে আমার পক্ষে এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ" এই বলিয়া শরৎ বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। মালতী আকুলভাবে কহিলেন, "দাঁড়াও শরং, একটুখানি দাঁড়াও—আর একবার তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি ;—তোমার আকৃতি এমন কোমল, হৃদয় কেন এত কঠিন হইল?"

শরৎ দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলেন। মালতী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শরৎকুমারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "যেও না শরৎ,—আমাকে বধ করে' যেও না।" শরৎ দৃঢ়স্বরে কহিলেন "পা ছাড়িয়া দিন্। ওরূপ সম্ভাষণ করিলে আর কখনও আমায় দেখিতে পাইবেন না।"

মালতী। হায় নিষ্ঠুর, বালিকা সুহাসিনীর সহিত প্রেমের অভিনয় করিতে তোমার সঙ্কোচ হয় না, দোষ হয় আমার বেলা! জানি না সে মায়াবিনী কিরূপে তোমায় যাদু করিয়াছে—হায়, আমি যদি সেই যাদু শিখিতাম!

শরৎ। পা ছাড়িয়া দিন্!

মালতী। শরৎ, এমন করিয়া সুহাসিনী যদি তোমার প্রেম ভিক্ষা করিত তুমি কি তাহাকে ত্যাগ করিতে? আমি স্বচক্ষে

দেখিয়াছি তুমি তাহাকে কতবার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছ! আর, আমি পায়ে ধরিয়াও তোমার মন পাইলাম না,—জীবন যৌবন আত্মসম্মান সমর্পণ করিয়াও তোমার হৃদয়ে তিলাদ্ধ স্থান পাইলাম না। হায় কঠিন মন!

শরৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "রমণীর নির্লজ্জতা অমার্জ্জনীয়। আপনি যদি জানেন আমি সুহাসিনীকে ভালবাসি তবে কেন আমায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বলিতেছেন?"

মালতী। মায়াবি, কপট, শঠ, তবে কেন বিশালাক্ষীকে প্রবঞ্চনা করিয়া সুহাসিনীর প্রতি আসক্ত হইয়াছ? এত যদি সাধু হইতে, তবে তুমি কখনও ধর্ম্মপত্নীকে প্রতারণা করিতে পারিতে না। সহধর্ম্মিণী সত্ত্বেও যদি সুহাসিনীর সহিত প্রেম বিনিময় করিতে পার, তবে কি আমাকে তোমার অগাধ প্রণয়ের কণিকামাত্র দান করিতে পার না?

মালতীর শ্লেষোক্তি শরতের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিল। তিনি দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, বিশালাক্ষীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### মালতীর কাণ্ড।

অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা মালতী প্রতিহিংসা লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। যেরূপেই হউক শরতের সর্ব্বনাশ করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইল। মালতী মনে মনে ভাবিলেন, "শরৎ, আমার শরৎ,—না, সুহাসিনীর শরৎ, আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে? প্রেমমুগ্ধা অবলাকে ঘৃণার সহিত পায়ে ঠেলিলে? ইহার প্রতিফল তোমায় ভোগ করিতে হইবে। নিরাশার বৃশ্চিকদংশনে তোমার জীবন শ্মশান করিব, তবে বুঝিবে রমণী নিষ্ফল প্রেমের কতদূর প্রতিশোধ লইতে পারে।"

ইতিমধ্যে শরৎ সুধীরের পূর্ব্ব পরামর্শ অনুসারে পরিবার লইয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিশালাক্ষীকে নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে মনের মত গড়িয়া লইবেন। কিন্তু সুহাসিনীর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার এখন দুই নৌকায় পা।

বিশালাক্ষী এক বৃদ্ধা দাসীর সহিত নূতন বাটীতে আসিয়া ঘর-সংসার পাতিলেন। লক্ষ্মীর পদার্পণে শীঘ্রই বাটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা—সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্নতা। আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিশালাক্ষী স্বামীর যত্ন শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিসে স্বামী সন্তুষ্ট হইবেন, কিসে তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে, সাধ্বী বিশালাক্ষীর শয়নে স্বপনে এই চিন্তাই প্রবল ছিল। কিন্তু তবু শরৎকুমার যেন কেমন উদাসীন, তবু তিনি সতীলক্ষ্মীর প্রতি যেন তত অনুরক্ত নহেন। বিশালাক্ষী জানিতেন না, শরতের পিছনে আর এক প্রবল আকর্ষণ আছে।

একটির পর একটি করিয়া দিনগুলি ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল। মালতী গায়ে পড়িয়া বিশালাক্ষীর সহিত ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে লাগিলেন। শরৎ উহা বিশেষ পছন্দ করিতেন না; কিন্তু প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে বাধা দেওয়াও অসম্ভব। কাজেই মালতীর আনাগোনা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত রহিল। তবে শরৎ বিশালাক্ষীকে সাবধান করিয়া দিলেন, "মালতীর সহিত বেশী মেশামিশি করিও না।"

কিন্তু বিশালাক্ষীর সহিত মালতীর আলাপ ক্রমে সখীত্বে পরিণত হইল। তাঁহারা সমবয়স্কা। একদিন সায়াহ্নে মালতী তাঁহাকে কহিলেন, "শুন বিশালাক্ষি, অনেক দিন হইল

তোমায় একটি কথা বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু,—না, বলিয়া কাজ নাই।

বিশালাক্ষী। বল না, মালতি!

মালতী। বলিব কি ছাই, বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। তোমার মনে বড় আঘাত লাগিবে,—কাজ নাই, অন্য কথা হোক্।

বিশালাক্ষী। কি কথা, মালতি! আমার মনে পাছে ব্যথা লাগে, সেই ভয়ে কিছু বলিতে চাহিতেছ না? আমার মন দৃঢ়। সামান্য কারণে আমি অধীর হইব না।

মালতী। তোমার মন কোমল—যে দুঃসংবাদ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত সামান্য মনে করিও না।

বিশালাক্ষী। দুঃসংবাদ? তোমার পায়ে পড়ি, মালতি, বল কি দুঃসংবাদ? আমার দিব্যি; বল, শীঘ্র বল। আমার উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া তোমার কি লাভ?

মালতী। শুনিবে যদি, তবে শুন, স্থির হইয়া শুন, বিশালাক্ষি! একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসিব। তুমি সত্য করিয়া বলিতে পার কি তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন?

বিশালাক্ষী। বাসেন বই কি?

মালতী। তোমাকে তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসেন কি?

বিশালাক্ষী। অত বুঝি না। তবে তিনি যতটুকু ভাল-বাসা দরকার বোধ করেন ততটুকু বাসেন।

মালতী। তুমি জান কি আর কেহ তোমার স্বামীর প্রেমের অংশভাগিনী?

চমকিতা হইয়া বিশালাক্ষী কহিলেন, "সে কি কথা"?

মালতী। বিশ্বাস কর, না কর, তাই প্রকৃত কথা। সেই জন্য তিনি তোমায় এত অনাদর করেন, সেই জন্যই তিনি সুবিধা হ'লেই আর একখানি ভাবমাখা মুখ দেখিতে উদ্গ্রীব হয়েন।

সবিস্ময়ে বিশালাক্ষী জিজ্ঞাসিলেন, "সে কে?"

মালতী। পরে জানিবে তোমার সুখের পথে কণ্টক সে রমণী—সে বালিকা কে?

বিশালাক্ষী। বালিকা? কে সে বালিকা? বল—মালতি, —আমার সন্দেহ আরও বাড়িতেছে। বল, সে কে?

মালতী। সে—সে—সু—

বিশালাক্ষী। সুহাসিনী?

মালতী। হাঁ, সুহাসিনী।

বিশালাক্ষী। আমিও তাই কতক অনুমান ক'রেছিলাম। তাঁর মুখে দিনরাত তারই প্রশংসা শুনিতে পাই।

মালতী। আর তিনি সময় ও সুবিধা পেলেই আমাদের বাড়ীতে আসেন।

বিশালাক্ষী ভাবিলেন, এই গুপ্ত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে ভাবিয়াই হয়ত তিনি মালতীর সহিত বেশী মেশামিশি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা সত্য, মালতি, তিনি কখন্ তোমাদের বাড়ীতে না যান? কিন্তু এজন্য যে যান তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

মালতী। কেবল যান! আর, প্রেমের অভিনয়টা?

মালতী তখন শরৎ ও সুহাসিনীর প্রণয়-ব্যাপার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিলেন। তাহা শুনিয়া বিশালাক্ষীর মাথা ঘুরিয়া গেল। আরব্ধ কার্য্যে সফলতা দেখিয়া কালসর্পীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। মালতী মনে মনে কহিলেন, "ঔষধ ধরিয়াছে।"

ডাক্তার বাবুর নিকট এ সকল কথা গোপন করিতে বলিয়া, অভাগিনী বিশালাক্ষীকে তাঁহার সকল দুশ্চিন্তার ভার একা বহন করিতে দিয়া, নাগিনী আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

বিশালাক্ষী ভাবিতে লাগিলেন, "তাঁহার কি দোষ? এ সকলই আমার অদৃষ্টের ফল। আমাকে পছন্দ হয় নাই বলিয়াই তাঁহার জীবনে সুখ হইল না। আমি কেন তাঁহার সুখের পথ আগুলিয়া থাকি? হায়, পোড়া যমও আমাকে দেখে না। জীবনের সাধ তো ফুরাইয়াছে। আর বাঁচিয়া

সুখ কি? এখন আমার মরণই মঙ্গল।" সে রাত্রি বিশালাক্ষী অনাহারে, অনিদ্রায় ও অশ্রুজলে অতিবাহিত করিলেন। সকলে বুঝিল, তাঁহার অসুখ করিয়াছে।

এদিকে মালতী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "প্রেমের পথ বড় সুগম নহে। কত শত্রু, কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত অন্তরায়, কত কষ্ট, কত জ্বালা, কত ব্যাকুলতা, কত ভয়, কত নৈরাশ্য, কত বিরহ, তবে মিলন ও সুখাস্বাদ। পরিণামে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আমার প্রেমের পথে কণ্টক দুইটি,—সুহাসিনী ও বিশালাক্ষী। সুহাসিনী চতুরা, বিশালাক্ষী সরলা। বিশালাক্ষীকে আমার সুখের অন্তরায় বলিতে পারি না। কেননা, তাহাকে শরৎ ভালবাসে না। তবু তাহাকে মারিতে হইবে। শরৎকে অসুখী করিতে হইবে। তাহাকে ভালবাসিবার একটি মাত্র প্রাণীও জীবিত রাখিব না। সকল কণ্টক দূর করিব। হায় শরৎ, মূর্খ শরৎ, কাঞ্চন ফেলিয়া সামান্য কাচের আদর করিলে! ছি—ছি—ছি! আমার এই ভরা যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ উপেক্ষা করিয়া একটি সামান্যা বালিকাকে ভালবাসিলে? কিন্তু,—এক বালিকার জন্য আমার এই প্রেমাভিলাষ ব্যর্থ হইবে? কখনও না—কখনও না। শরতের সাধ্য কি, আমাকে ফেলিয়া সুহাসিনীকে লইয়া সুখী হয়? জীবন থাকিতে উহাদের মিলন হইতে দিব

না। এত করিয়াও যদি শরৎকে না পাই, তাহার জীবন মরুভূমি করিয়া সুখী হইব। হায় নিষ্ঠুর, এখনও রমণীচরিত্র বুঝিলে না?”

স্বীকার করি, নারী-হৃদয় পুরুষের হৃদয় হইতে স্বভাবতঃ কোমল। কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ে একবার ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। বিশালাক্ষী মালতীর কোন দিন ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট করেন নাই। তবু কেন মালতী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত? কাহারও অনিষ্ট না করিলে যে অপরে অনিষ্ট করিবে না এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। মনুষ্যচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। হিংস্র পশুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা বরং সম্ভবপর, কিন্তু পয়োমুখ মনুষ্যনামধারী জীবের নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যেরা নিঃস্বার্থভাবেও পরের অপকার করিয়া থাকে। জগতের গতি এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিলে মনুষ্যজাতি অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকারিতাও বিরল নহে বলিয়া আমরা আজিও বাঁচিয়া আছি।

শরৎ প্রত্যাখ্যান করিলেও মালতী আশা ছাড়েন নাই কেন? এ সংসারে কে প্রবল হৃদ্গত আশা সহজে ছাড়িয়া থাকে? আর এক কথা। ব্যাঘ্রীর স্বভাব হিংসা, ক্ষুধার্ত্ত না হইলেও সে প্রাণি-হনন করিবে। নারীর স্বভাব পুরুষ জয়

করা। লাভ হউক বা না হউক, আবশ্যক না হইলেও, সে শিকার করিবে। কেননা, শিকারে সুখ আছে, আত্মপ্রসাদ আছে। বালক যেরূপ প্রজাপতি লইয়া খেলা করে, মার্জার যেরূপ মূষিক লইয়া খেলিয়া বেড়ায়, রমণীও সেইরূপ পুরুষের হৃদয় লইয়া খেলিতে ভালবাসে। মালতী ভাবিলেন, তাঁহার নেত্রপথে যদি একটি সুপুরুষ পড়িয়াছে, তবে তিনি কেননা তাহার হৃদয় লইয়া খেলিবেন ?

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

---

## একটি চুম্বন।

বিশালাক্ষীর কি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি আহারনিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি স্বামীর যত্ন-সেবায় কোন ত্রুটি হয় নাই। পতির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সাধ্বী সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন বিশালাক্ষী স্বামীকে কহিলেন, "আমি কিরূপে তোমার মনের মত হইতে পারি তাহাই আমাকে শিখাও।"

শরৎ। কিসে পতি বশ হয়, রমণীকে কি তাহা শিখাইতে হয়?

বিশালাক্ষী। তবে কেন সকল স্ত্রী স্বামীর মনের মত হয় না?

শরৎ। তা' উভয় পক্ষের দোষ।

বিশালাক্ষী। দোষ হউক বা না হউক,—কি করিয়া পতিপ্রেমবঞ্চিতা স্ত্রী স্বামীর আদর পায়, স্ত্রীলোকের তাহাই

শেখা উচিত। আমাকে বলিয়া দাও আমি কেমন করিয়া তোমার মনের মত হইব।

শরং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বিশালাক্ষি, কে বলিয়াছে তুমি আমার প্রেমে বঞ্চিতা? আমি কি কখনও তোমায় অনাদর করিয়াছি, কখনও কি তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি বা তোমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?

বিশালাক্ষী। অনাদর বা অন্যায় ব্যবহার না করা আর ভালবাসা পৃথক্। তুমি আমায় ভালবাস না।

শরং। বাসি বৈ কি।

বিশালাক্ষী। আমি মূর্খ অবলা, তুমি বিদ্বান্। কিন্তু সামান্য বালিকাও পুরুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দর্পণের ন্যায় দেখিতে পায়। তোমরা পুরুষ, লড়া'য়ে সেপাই। সেপাইরা মত্ত থাকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, তোমরা থাক পুঁথি ও অর্থার্জ্জন লইয়া। সামান্যা স্ত্রীলোকদিগের সুখদুঃখ চিন্তা করিবার অবসর তোমাদের কোথায়? কিন্তু আমরা তোমাদের দাসী। তোমরাই আমাদের সব। তোমাদের হৃদয়ে কখন কি দাগ পড়ে তাহা দেখাই আমাদের কাজ। তোমরা না বলিলেও আমরা তোমাদের হাবভাবে, কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে সকলই বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছি, আমি বোধ হয় তোমায় সুখী করিতে পারি নাই।

এই বলিয়া বিশালাক্ষী কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎকুমার পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি বৃথা কষ্ট পাইতেছ। আমি তোমায় ভালবাসি।"

ক্ষণিক উত্তেজনায় সহিত বিশালাক্ষী কহিলেন, "তুমি আমারই ? নাথ, প্রভো, স্বামিন্! আবার বল, তুমি আমায় ভালবাস।"

শরৎ। বাসি, বিশালাক্ষী!

শরৎ পত্নীর কৃষ্ণতার প্রান্তলোহিত আয়তনেত্রের প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। তরুরাজি নূতন পল্লব বসন পরিয়াছে। পুষ্পবতী লতাগুলি তাহাদিগকে সকাম আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। বিশালাক্ষীও শরৎকে জড়াইয়া থাকিতে উদ্‌গ্রীব। কৈশোরে বিরহ জ্বালা সহা যায়,—কেননা, প্রেমের তখন উন্মেষ মাত্র ; কিন্তু, যৌবনে বড় দায়। সম্মুখে প্রণয়ের পূর্ণ সুধাকুম্ভ, তাহাতে যৌবনের দারুণ তৃষা। উহা হইতে এক বিন্দুমাত্র পান করিলে হৃদয় জুড়ায়। এরূপ অবস্থায় এই অবসর কে ত্যাগ করিয়া থাকে ?

স্বামিস্ত্রীতে যে ব্যবধান ছিল তাহা কতকটা সঙ্কীর্ণ হইল। বিশালাক্ষীর পক্ষ্মাবলী অশ্রুসিক্ত, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ। আকাশে ইন্দ্রধনু মনোহর, কিন্তু কামিনীতে উহার শোভা আরও মধুর।

ইহার পর কিছুদিন ভালভাবে কাটিয়া গেল। ডাক্তার বাবুর আত্মগ্লানি হইল। তিনি সুহাসিনীকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বেশী দিন ভুলিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণী পুরুষের উপগ্রহ। গ্রহে উপগ্রহে যেরূপ প্রবল আকর্ষণ, স্ত্রীপুরুষেও সেইরূপ। শরৎসুহাসিনী পরস্পরের টানে আপনাহারা।

ইহার পর মালতী সুহাসিনীর কথা পাড়িলে বিশালাক্ষী প্রথম প্রথম কহিতেন, "ও কথা থাক্। এস, অন্য বিষয়ে গল্প করি।" কিন্তু শরতের আচরণে ক্রমে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিশালাক্ষী মালতীর কথা শুনিতে আর বড় একটা বাধা দিতেন না।

একদিন মালতী কহিলেন, "বিশালাক্ষি, তুমি আমায় এত অবিশ্বাস কর কেন? স্বচক্ষে সকল ঘটনা দেখিতে চাও কি?" কিঞ্চিৎ ভাবিয়া সরলা মহিলা কহিলেন, "না।" মালতী আবার কহিলেন, "দেখ,—স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর। দেখিতে ভয় কি? মন দৃঢ় কর।"

বিশালাক্ষী। ভয় নয়। দেখিয়া কাজ নাই।

আবার কি ভাবিয়া বিশালাক্ষী কহিলেন, "আচ্ছা, দেখিব।"

মালতী তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি অসুখ হইয়াছে বলিয়া দুই দিন শুইয়া থাক। আমি যখন ডাকিব তখন

আসিয়া সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিবে।” বিশালাক্ষী সম্মতা হইলেন।

ইহার পরদিবস দ্বিপ্রহরে শরৎকুমার বেচারাম বাবুর বাটীতে গেলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন আদালতে। পুত্র স্কুলে। সুহাসিনী শরতের সহিত তাঁহাদের বাহিরের কক্ষে গল্প করিতেছেন। গল্প, না প্রেমালাপ? শরৎ বালিকার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “মানিনি, এত সাধের মান কোথায় গেলে?” সুহাসিনী কহিলেন, “যাও, আর চাতুরীতে কাজ নেই। তোমার প্রেম যে কত গভীর তা’র যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। আর মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া দরকার কি?” শরৎ সুহাসিনীর অধরোষ্ঠ চুম্বন করিয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন, “পাগলিনি, তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা।”

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে বিশালাক্ষী শরতের কাণ্ড দেখিয়া ঘৃণায় ও রোষে ঘন ঘন অধর দংশন করিতে লাগিলেন এবং বিনাবাক্যব্যয়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুশূন্য।

বিশালাক্ষী বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া স্থির করিলেন, বিষ-পানে তাঁহার সকল যন্ত্রণা শেষ করিবেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার ঘুম হইল না। পর দিবস ডাক্তার বাবু যখন বাটী ছিলেন না,

তখন মালতী আসিলে বিশালাক্ষী তাঁহাকে কহিলেন, "মালতি, যে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত তাহার জীবনে সুখ কি? আমি বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" মালতী তাহাতে যৎসামান্য বাধা দিয়া কহিলেন, "তা' ভাই, সত্যি। পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হ'লে বেঁচে থাকা মিছে।" তারপর বিশালাক্ষী শরতের আলমায়রা হইতে বিষ আনিয়া কহিলেন, "মালতি, এই অমৃত আনিয়াছি।" ব্যাপার দেখিয়া মালতী তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বিশালাক্ষী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কহিলেন, "সর্ব্বনাশি, দাঁড়াও। সে দিন আমাকে যে দৃশ্য দেখাইয়াছ, যাহা দেখাইয়া আমার জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছ, তাহার শেষ ফল দেখিয়া যাও। আমার স্বামী অপরকে ভালবাসেন শুনিয়া যে অনিষ্ট হয় নাই, তুমি অপরের সহিত তাঁহার আসক্তি দেখাইয়া তাহার অধিক অনিষ্ট করিয়াছ। তুমি আমার হৃদয়ের সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল করিয়াছ, আমাকে বধ করিয়াছ। মায়াবিনি, দেখিয়া যাও, হাসিতে হাসিতে উহা আমি কিরূপে পান করি।"

মালতী গর্জ্জিয়া কহিলেন, "বটে, আমি যে উপকার করিয়াছি, ইহাই বুঝি তাহার পুরস্কার!"

ক্রোধভরে মালতী গৃহে চলিয়া গেলেন। বিশালাক্ষী ঝিকে বুঝাইলেন, আজ তাঁহার বড় শুভদিন। পরে উজ্জ্বল

রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া কপালে সিন্দূর দিয়া, বিষপাত্র লইয়া আপন কক্ষে গিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়, আমার সকলই তো ফুরাইয়াছে। এ জীবন-নিশা শেষ হওয়াই ভাল। কিন্তু মরিবার সময় একবার পতির চরণ দর্শন করিলে সুখী হইতাম। নাথ, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমায় না বলিয়া আমি অজ্ঞাতলোকে চলিলাম। এ জীবনে আর দেখা হইবে না। জানি না, পরলোকে তোমায় পাইব কি না। হয়ত, পাইব না—আর দেখিব না।" অশ্রুজলে বিশালাক্ষীর গণ্ডদ্বয় সিক্ত হইল। পতিব্রতা সতী অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। বিশালাক্ষী তাহা শুনিতে পাইয়া দ্রুতগতি হলাহল পান করিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিলেন, "নাথ, প্রভো, হৃদয়সর্ব্বস্ব, আসিয়াছ? দাসীর এই শেষ দেখা। এস প্রিয়তম, তোমার পা' দুখানি মাথায় রাখিয়া জীবন সার্থক করি।"

সবিস্ময়ে শরৎকুমার কহিলেন, "বিশালাক্ষি, পাগল হইলে না কি?" বিশালাক্ষী কহিলেন, "হাঁ, তোমায় দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছিলাম। করুণাময় ঈশ্বর আমার সে সাধ মিটাইয়াছেন। আর আমার মরিতে দুঃখ কি?"

ডাক্তার বাবু মেঝের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিলেন, বিশালাক্ষী বিষ পান করিয়াছেন। বিষপাত্র সম্মুখেই ছিল। ক্ষিপ্রতার জন্য তাঁহার পত্নী উহার সবটা নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে অবসর পায় নাই। তাই রক্ষা, নহিলে কি হইত? হায়, হায়, আর একটুকু পরে আসিলেই তো বিশালাক্ষী ফাঁকি দিয়াছিল। এ সকলই তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল বিবেচনা করিয়া ডাক্তার বাবু মর্ম্মাহত হইলেন ও বিষাদে অধীর হইয়া বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "হায়, বিশালাক্ষি, কি করিলে?" ঝি চীৎকার করিয়া উঠিতেই ডাক্তার বাবু তাহাকে বাধা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। পরে বিষ তুলিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পত্নীর পাকস্থলী হইতে সকল বিষ বাহির করিলেন।

অনুতাপে কাতরস্বরে শরৎ কহিতে লাগিলেন, "আমার বিশালাক্ষি, আমার প্রাণের বিশালাক্ষি, আর একটুকু পরে আসিলেই তো তোমায় হারাইতাম। ভগবানের অপার দয়া। তাই আমি তোমায় ফিরিয়া পাইয়াছি। নহিলে আমার সাত-রাজার ধন আমায় ফাঁকি দিয়াছিলে আর কি? বল, প্রিয়ে, বল তুমি কেন আত্মঘাতিনী হইতেছিলে?"

বিশালাক্ষী শরৎকে বক্ষে লইয়া কহিলেন, "প্রভো, স্বামিন্,

হৃদয়ের ধন, বড় কষ্টে তোমায় ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমি ভাবিতাম, তুমি যেন কি চাও, আমাতে তাহা পাও নাই,—আমি তোমায় সুখী করিতে পারি নাই।” বিশালাক্ষী সুহাসিনী-ঘটিত সকল কথা গোপন করিলেন। শরৎও সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, “সত্তি, লক্ষ্মি, আমি তোমায় অনাদর করিয়াছি। বল, আমায় ক্ষমা করিবে!”

বিশালাক্ষী কহিলেন, “দাসী হ’য়ে তোমায় ক্ষমা করিব? দেবতা আমার, তোমায় মাথায় রাখিব। জীবনসর্ব্বস্ব, দাসীকে কখনও চরণে ঠেলিও না।”

শরৎ আবেগের সহিত বিশালাক্ষীকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাঁহার গণ্ডে ও অধরোষ্ঠে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই কঠিন ভুজবন্ধন ও প্রাণস্পর্শী চুম্বন হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাঁহার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না। বিশালাক্ষী চক্ষু বুজিয়া এইরূপে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদ লইতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ কহিলেন, “বিশালাক্ষি, আমাকে দিবার কি কিছুই নাই? কেবল লইবে, এমন হইতে পারে না।” বিশালাক্ষী তাঁহার কোমল বাহুলতা দ্বারা পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। শরতের শিরায় শিরায় সে চুম্বনের তাড়িত প্রবাহ ছুটিল।

একটি চুম্বনে শত চুম্বনের সূত্রপাত হইল। দম্পতীযুগল আজ পরস্পরের অধর-সুধা পানে বিভোর।

শরৎ মনে মনে কহিলেন, "জানি না কোন্ পুণ্যফলে এমন রত্ন পাইয়াছি। আমি ভ্রান্ত, রত্ন চিনিতে পারি নাই।"

ইহার পর স্বামিস্ত্রীতে অচ্ছেদ্য প্রণয় জন্মিল। বিশালাক্ষী অতি যত্নে বিষপাত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন। শরৎকুমার উহা চূর্ণ করিতে চাহিলে তিনি বাধা দিয়া কহিতেন, "উহাতে যে সুধা ছিল, তাহারই বলে আমি তোমায় পাইয়াছি। বিষপাত্র আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপে রাখিতে দাও।"

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

## সুধীরের উপদেশ।

সুধীর কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশালাক্ষীর বিষ-পানের বিষয় যথাসময়ে অবগত হইলেন। কিন্তু শরৎ সুহাসিনী-ঘটিত কোন কথা বন্ধুকে জানাইলেন না। বিশালাক্ষী কেন বিষ পান করিয়াছিলেন সুধীর তাহার কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইলেন।

ইহার পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদা দুই বন্ধু কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পিয়ন সুধীরকে এক বেনামি চিঠি দিয়া গেল। তাহাতে শুধু লেখা ছিল, "আপনি ডাক্তার বাবুর বন্ধু। ভরসা করি, সুহাসিনীর হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।" সুধীর বিনা বাক্যব্যয়ে পত্রখানি শরতের হস্তে দিলেন। শরৎ পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। পরে আপনার পদস্খলনের কথা ও মালতীর আত্ম-প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই বন্ধুকে জানাইলেন। পূর্ব্বে লজ্জাবশতঃ এই কথা গোপন করায় সুধীরের নিকট কাতর-

বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুধীর ক্ষমা করিলেন, কিন্তু ইহার পর দাম্পত্য-বিধির ব্যভিচার করিলে তাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদের ভয় দেখাইলেন।

মালতী প্রতিহিংসা লইবার জন্যই যে ঐ পত্র লিখিয়াছেন, শরৎ তাহা সুধীরকে বুঝাইলেন। সুধীর কহিলেন, "বিশালাক্ষী নিশ্চয়ই তোমার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। উহাই বিষপানের কারণ।" পরে বিশালাক্ষীও তাহা স্বীকার করেন।

ইহার পর সুধীর শরৎকে নানারূপ উপদেশ দিলেন। তিনি কহিলেন, "স্বামিস্ত্রী মরণান্ত পর্য্যন্ত কেহ কাহাকে ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে মনে মনেও অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহভোগিনী। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, ভগবান্ কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে সম্মিলিত করিয়াছেন। জন্মের পর বিবাহ একটি প্রধান ঘটনা। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষই বা কোথায়, স্ত্রীই বা কোথায়, কে কাহার? তার পর কোন্ এক অজ্ঞেয় অলক্ষ্য সূত্রে দুইটি জীবন একত্র হইল; উভয়ের হৃদয় এক, লক্ষ্য এক, সুখ দুঃখ এক হইয়া গেল। বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম বংশের কল্যাণকর, জগতের হিতকর, ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ইন্দ্রিয়সুখ অকিঞ্চিৎকর। যাহাতে দম্পতীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, স্বামিস্ত্রীর তাহাই কর্ত্তব্য।"

সুধীর পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আমি তোমায় যে উপদেশ দিতেছি তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। এ সকল শাস্ত্রের উপদেশ। শাস্ত্রে আছে, যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি নিত্যসন্তুষ্ট সে পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত। স্বামিস্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবেন। কেহ কাহারও প্রতি রুষ্ট হইবেন না, বা কটূক্তি করিবেন না; যাহাতে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে কিম্বা অভিশাপ বুঝায়, এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। যাহাতে মন অপবিত্র হয় এরূপ বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিবেন না। কেহ কাহাকেও হীন বোধ করিবেন না, অথবা অপরের চক্ষে হেয় করিবেন না। পরস্পরে গভীর বিশ্বাস ও অচ্ছেদ্য প্রণয় থাকা চাই। পরস্পর প্রিয়াচরণ দাম্পত্যসুখের মূল। একের দোষ অন্যে মার্জ্জনা করিবেন, একের দুর্ব্বলতা অন্যে প্রকাশ করিবেন না। শ্রী ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই। গৃহিণীই গৃহের শোভা। মনে রাখিবে, স্ত্রী যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা বা গৃহপালিত জীব নহেন, তিনি পুরুষের সুখসৌভাগ্যবিধায়িত্রী কল্যাণময়ী দেবী; স্ত্রী দাসী নহেন, প্রিয়তমা সখী। স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইবেন ও সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্য করিবেন। স্বামী আশ্রয়তরু, স্ত্রী আশ্রিত লতিকা। লতিকা কিরূপে আশ্রয়তরু ছাড়িয়া থাকিবে? স্বামীই স্ত্রীর সকল তীর্থ। স্বামীই স্ত্রীর

জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা-যাগ-যজ্ঞ। সতত স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। স্বামীই স্ত্রীর গতি, মুক্তি, স্বর্গ। স্বামী অসৎ হইলেও স্ত্রীর অত্যাজ্য। আবার, যে পুরুষ পতিপ্রাণা মিতভাষিণী ভার্য্যাকে মনঃকষ্ট বা যন্ত্রণা দেন তাঁহার নরকেও স্থান নাই। স্বামীর প্রিয় ও হিতকারিণী ধর্ম্ম-পরায়ণা পত্নীকে যে প্রীতি ও সমাদরের সহিত প্রতিপালন না করে সে পাষণ্ড, এরূপ স্ত্রীকে যে পরিত্যাগ করে সে পশুরও অধম। আর এক কথা, শরৎ! মনই স্বর্গ, মনই নরক। মনেই পাপ, মনেই পুণ্য। যাহাতে অন্তঃকরণ পবিত্র থাকে স্ত্রীপুরুষ তাহাই করিবেন। ধর্ম্মালোচনায় মন পবিত্র হয়। স্বামিস্ত্রী ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। সহস্র অবরোধে, সহস্র রক্ষি-পরিবৃত হইয়াও স্ত্রীগণ অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন কেবল তাঁহারাই সুরক্ষিতা। তাই বলি, মন ঠিক্ রাখাই প্রধান কথা। পতিপ্রাণা স্ত্রীর পক্ষে নিরন্তর পতিস্মরণ পরম ধর্ম্ম। পুরুষেরও যথেচ্ছাচারী হইবার অধিকার নাই। সতী স্ত্রী চাহিলে নিজে সংপতি হইতে হইবে।”

সুধীরের নিকট এই সকল উপদেশ পাইয়া শরৎ চিত্ত আরও দৃঢ় করিলেন। তিনি ভাবিলেন, “সুধীর স্ত্রীর কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার বিশালাক্ষীতে তো সে সকল গুণই আছে। স্বামীর যাহা করণীয়, আমি তাহা করি নাই,—হায়, কেবল আমার দায়িত্ব-বোধ হয় নাই। অন্তর্যামী ভগবানের নিকট আমি অপরাধী। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? দেবি বিশালাক্ষি, আমি তোমার অনুপযুক্ত, আমি মহাপাতকী। তুমি কিরূপে আমায় ক্ষমা করিবে?”

শরৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আর একদিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুহাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কারণ দ্বিবিধ,—প্রথম, সঙ্কল্প,—বিশালাক্ষীর মনে আর কষ্ট দিবেন না। দ্বিতীয়, ভয়,—যদি চিত্তের দুর্ব্বলতায় লক্ষ্য-হারা হয়েন। সুহাসিনীর সকল আশা ফুরাইল। তিনি কাঁদিলেন, চিঠি লিখিলেন, একটি বার দেখা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—তবু শরৎ পত্রের উত্তর দিলেন না, সাক্ষাৎও করিলেন না। শরৎ অচল অটল। সুহাসিনী ভাবিলেন, “পুরুষের মন কি কঠিন! পুরুষ রৌদ্র, স্ত্রীলোক জ্যোৎস্না; পুরুষ কঠোরতা, স্ত্রীলোক কোমলতা। হায় নিষ্ঠুর! ভালবাসার বারিবিন্দুদানে কেন এই দগ্ধ হৃদয় শীতল করিলে? মজাইলে তো কেন লুকাইলে?” কিন্তু শরৎ কিছুতেই ভুলিলেন না। কেননা, পুরুষ কর্ত্তব্য, রমণী মোহ; পুরুষ চেতনা, রমণী সুপ্তি।

এই সকল ঘটনার পর একমাস কাটিয়া গেল। মালতী শরৎকে এক আবেগপূর্ণ প্রেমপত্র লিখিলেন। শরৎ সেই পত্রের শিরোভাগে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া উহা ফেরৎ পাঠাইলেন। শরৎ লিখিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম। যাহাতে ভগবানের নিকট ক্ষমা পান তাহা করিবেন।"

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

## অভাগিনী।

নন্দলাল ও উমেশ কলিকাতায় গিয়া আমোদে গা ভাসাইয়াছেন। মাঝে উমেশ একবার খাজানা আদায় করিতে মোহনপুরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর গুণধরেরা বাটীর আর কোন সংবাদ লয়েন নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, লোকেও নানারূপ কাণাকাণি আরম্ভ করিল। ক্রমে কালীতারা উঁহাদের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। উঁহারা ব্যতীত কালীতারা এ সংসারে আর কাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে পারেন? কিন্তু অতি নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তি হইতেই মহাক্লেশ ও দুর্ব্যবহার প্রসূত হয়, নিতান্ত আপনার লোকই ভয়ানক শত্রুতা করিয়া থাকে, যাহাকে অত্যধিক ভালবাসা যায় সেই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেয়, যাহার পরম উপকার করিবে সেই ভাষণ শত্রু হইবে, যাহাকে অপরিমিত বিশ্বাস করিবে সেই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক হইবে। পৃথিবীর নিয়ম এইরূপ। স্বল্পবুদ্ধি কালীতারার জন্য জগতের সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

যাহার বাড়া কষ্ট ঘোষজায়া কখনও কল্পনা করেন নাই সে

কষ্ট তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, ভবিষ্যতের যে মনোহর মানস-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। উগ্রা রণচণ্ডী এখন সামান্যা দুঃখিনী রমণী মাত্র। অদৃষ্টের পেষণ এমনই বটে! একে নানারূপ মনঃকষ্ট, তদুপরি প্রতিবেশিনীগণের তীব্র সমালোচনা। সেই হলাহল উদ্গার-কারিণী রমণীরসনাকে সংযত করা কাহার সাধ্যায়ত্ত? জিহ্বার প্রধানতঃ তিনটি দোষ। প্রথম, লোভ; দ্বিতীয়, মিথ্যাভাষণ; তৃতীয়, কলহ।

কালীতারা উন্মাদগ্রস্তা হইলেন। তিনি এখন পাগলিনী। অভাগিনী কমলিনীর কষ্টের সীমা নাই। হউক বিমাতা, তবু তাঁহার প্রতি বালিকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কম ছিল না। চিরদুঃখিনী বিষাদে আরও অভিভূতা হইলেন। উন্মাদিনীকে কেহ উত্ত্যক্ত করিলে কমলিনী কাতরবচনে তাহাকে নিরস্ত করিতেন। কিন্তু এভাবেও দিন কাটিল না।

একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, পাগলিনীর মৃতদেহ গৌরীবক্ষে ভাসিতেছে।

কমলিনী শুধু কাঁদিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি শেষ হইতে না হইতে আর একটি বিপদ আসিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

এখন কমলিনী কোথায় যাইবেন? তাঁহার এই অপরিণত

বয়স, ম্লান হইলেও অভাবনীয় সৌন্দর্য্য। তিনি আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া কিরূপে বাস করিবেন? একে তিনি বালবিধবা, তাহার উপর এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তিনি কিরূপে মোহনপুরের বাটীতে একা বাস করিবেন? শ্বশুরালয়েও তাঁহার স্থান নাই। কারণ, বিবাহের পরই স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তত্রত্য সকলে তাঁহাকে অকল্যাণের আকর মনে করিতেন। কমলিনী আশ্রয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়ীর নিকট যদুসিংকে পাঠাইলে তিনি কহিলেন, "বৌমাকে গিয়া বল, তিনি আমার গঙ্গাকে খাইয়াছেন। এখানে আসিলে আরও যে কত অমঙ্গল হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। অমন মানুষ-খেকো ডাইনীকে ঘরে রাখিবার দুঃসাহস আমার নাই।"

যদুসিং ফিরিয়া আসিল। কমলিনী নানা দুশ্চিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন কি করিবেন?

এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুইটি ভদ্রমহিলা কাশীবাসিনী হইবার জন্য সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছেন শুনিয়া কমলিনী তাঁহাদের সঙ্গিনী হইলেন। যদুসিংও তাহার 'বেটীর' সঙ্গে চলিল।

---

# বিংশ পরিচ্ছেদ।

## রাজপথে।

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা একটি অপূর্ব্ব সহর। ইহার বিচারালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অলঙ্কার। ইহাতে মহাবাগ্মী, মহাপণ্ডিত মহা সাধু আছেন, আবার পৃথিবীর মধ্যে অতি নিকৃষ্ট, অতি হেয়, নরাধম পর্য্যন্ত আছে। এখানে দিবা-রাত্রি কোলাহল, অবিশ্রান্ত গণ্ডগোল। কেহ কাজে ব্যস্ত, কেহ অকাজে ব্যস্ত। কিন্তু ব্যস্ত সকলেই।

পাঠক, গড়ের মাঠ দেখিয়াছেন? উহা কলিকাতার হৃৎপিণ্ড। উহারই পূর্ব্বে রাজধানীর গৌরব, চৌরঙ্গী রাস্তা। অপরাহ্ণ কাল। বড় গরম পড়িয়াছে। কত সাহেব-বিবি, কত মাড়োয়ারি, রাজা-জমিদার, বণিক্‌, দেশী বিদেশী ভাগ্যবান স্ত্রীপুরুষ জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছেন। অশ্বের দ্রুত পদশব্দ ও শকটচালকের 'হেইও জানেওয়ালা' রব কর্ণ বধির করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অশ্বখুরোত্থিত অসংখ্য ধূলিরাশি স্বল্প-ভাগ্য ব্যক্তিগণের চক্ষু আচ্ছন্ন করিতেছে,—ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃক্‌পাত নাই, লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ পার্শ্ববর্ত্তী পথিকদিগকে তৃণ-

স্নান করিয়া স্মিতমুখে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। নির্ধন ও দুর্ব্বল পথ ছাড়,—যদি ইচ্ছা হয়, সবিস্ময়ে ধনবানগণের অতুল ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ কর; কিন্তু সাবধান, পিছনে বড় ভিড়, লোকের পর লোক চলিতেছে, হোঁচোট্ খাইও না। তার-পর, ঐ দেখ গাড়ী, একটা গাড়ী, ঐ আর একটা গাড়ী, গাড়ীর পর গাড়ী, অসহিষ্ণু ঘোড়াগুলি ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিতেছে; চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইও না।

গড় গড়—গড় গড় শব্দে একখানা জুড়ি চলিয়া গেল। তুমি কে গা, অমন হাঁ করিয়া চাহিয়া আছ? দেখিলে, বাস্—চলিয়া যাও, অমন করিয়া পথের মাঝে দাঁড়াইলে কেন, বাপু? নন্দলাল বাবুকে চেন বুঝি? তা' চেন বলিয়া বেকুবের মত অমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? হাঁট—হাঁট। সে কি? তুমি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে দেখিতেছি। বাঃ, একেবারে যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে! মাথা ধরিয়াছে বুঝি? তা'ও তো নয়। চক্ষে জল,—কাঁদিতেছ না কি? তাই, তাই,—সত্যই তো তাই। তুমি কে?—হাঁ, চিনিয়াছি, তুমি কাশী-পুরের নায়েব গৌরবিনোদ ঘোষ।

পুলিশের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া নায়েব মহাশয় পলাতক হইয়াছিলেন। ছদ্মবেশে পশ্চিমের কতকগুলি তীর্থস্থান দর্শন করিবার পর তিনি হঠাৎ কঠিনপীড়াগ্রস্ত হয়েন। প্রথমে

জীবনের কোন আশা ছিল না। মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। শেষে এক ব্রহ্মচারী তাঁহাকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া ঔষধ ও পথ্য দিয়া আরোগ্য করিলেন। পীড়া সারিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা দূর হইতে অনেক সময় লাগিল।

কাল নায়েব মহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনেক দিন বাড়ীর খবর জানেন না। ছদ্মবেশে সকল সংবাদ লওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। ঘোষজা যখন চৌরঙ্গী রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন তখনও তিনি জীর্ণশীর্ণ। তাঁহার আকৃতি হইতে রোগের ছায়া তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

নন্দলাল চলিয়া গেলেন। নায়েব মহাশয়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত ভাবনা, সহস্র আশঙ্কা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। নন্দলাল কিরূপে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল? তবে—তবে বুঝি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সকল অর্থ গ্রাস করিয়াছে! সত্যই কি? নন্দলাল কি এরূপ আচরণ করিতে পারে? না, অসম্ভব। কিন্তু তাহার পার্শ্বে ঐ যে আর একখানি পরিচিত মুখ দেখা গেল। ও তো উমেশ। তাই কি? না, না,—মনে তো হয় না, উহারা এতদূর সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বোধ হয়, দেখিবার ভুল হইয়াছে। আর কাহারও সহিত নন্দলাল ও উমেশের আকৃতি সাদৃশ্য থাকা

কি অসম্ভব? নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে,—মস্ত একটা ভুল হইয়াছে।

ঘোষজা অনেক ভাবিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইবেন না কি? দূর হোক্ ছাই। আর ভাবিয়া কাজ নাই। ভাবিব না বলিলেও ভাবনা আসে। মনে একবার একটা সন্দেহ জন্মিলে কি চিন্তার হাত সহজে এড়ান যায়?

নানারূপ চিন্তা করিয়া নায়েব মহাশয় স্থির করিলেন, আবার কাল ঠিক্ ঐ সময়ে বা তা'র কিছু আগে আসিতে হইবে,—আসিয়া দেখিতে হইবে, শকটারোহিদ্বয় নন্দ ও উমেশ কি না। গাড়ীখানা তো ঠিক মনে আছে?—হাঁ, তা' আছে বৈ কি?

পরদিন অপরাহ্নে সেই পরিচিত জুড়ি চৌরঙ্গী দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে নন্দলাল ও উমেশ উপবিষ্ট। ও হরি! তবেই তো সব গিয়াছে, সকলই লুঠিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাইত,—তাইত, এখন উপায়? গৌরবিনোদের শিরে বজ্রপাত হইল।

সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। ক্ষণিক তন্দ্রাকালে তিনি দেখিলেন,—নন্দলাল ও উমেশ অপূর্ব্ববেশে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছে; তাহারা হাসিতেছে, বহু দাস-

দাসী ও স্তাবকগণ তাহাদের আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান। নন্দ ও উমেশ আসিয়াই কহিল, "আপনি শীঘ্র কলিকাতা ত্যাগ করুন। পুলিশ সন্ধান পাইলেই আপনাকে গ্রেপ্তার করিবে। আর, আপনার বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ তাহাতে ফাঁসী হওয়াই সম্ভবপর। আপনার অর্থ ছিল, ভোগ করেন নাই; আমরা তাহা ভোগ করিতেছি। তাহাতে ক্ষতি কি? আগে প্রাণ বাঁচাইবেন, না, অর্থের দাবী করিবেন? দাবী করিলেও পাইবার ভরসা কি?" তন্দ্রা ভাঙ্গিলে নায়েব মহাশয় ভাবিলেন, "তাই ত! কি করা যায়? একবার উহাদের সঙ্গে দেখা করিলে হয় না? আমার নামে এখনও কি ওয়ারেণ্ট আছে? তাহাও তো ঠিক্ জানা দরকার। আমাদের ঘরের উকীলকে গোপনে সব জিজ্ঞাসা করা কেমন? তাই স্থির।"

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### খুনের মামলা।

নায়েব মহাশয় সঙ্গোপনে উকীলের বাড়ী গেলেন। গিয়া খুনের মামলা সম্বন্ধে যাহা জানিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

দীর্ঘকালব্যাপী বিচারের পর জজ সাহেব এসেসরদ্বয়কে কহিলেন, "অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চারি জন যে হত্যা-কার্য্যে সম্পূর্ণ লিপ্ত ছিল, তাহা উপস্থাপিত প্রমাণ দৃষ্টে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন। অপর আসামীগণ হত্যাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে।" সকলেই ভাবিয়াছিলেন, দায়রায় সোপরদ্দ ব্যক্তিগণ বেকসুর খালাস পাইবেন। কিন্তু জজ বাহাদুরের মত প্রকাশে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার তরফদার অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এসেসর-দ্বয়ের নিকট আসামীদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিলেন। বক্তৃতাশেষে তিনি রোষে ও উত্তেজনায় জজকে কহিলেন, "আপনার মত সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। যেরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম।" বাধা দিয়া

জজ সাহেব তীব্রস্বরে কহিলেন, "আমার অভিমত সম্বন্ধে এখানে সমালোচনা করা আপনার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আপনার প্রতি আমার উপদেশ,—ভবিষ্যতে সংযত ভাষা ব্যবহার করিবেন; নতুবা, আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হইবে।" মিষ্টার্ তরফদার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "সচ্ছন্দে।"

জজ ও ব্যারিষ্টারে এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি হঠাৎ বিচারকক্ষে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর জনতা বাড়িল। পুলিশ বেটন দিয়া জনসাধারণকে আদালত হইতে ঠেলিয়া বাহির করিতে লাগিল। আগন্তুক আমীর খাঁ। আমীর জজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার, আসামীগণ নির্দ্দোষ। আমি উজীর হোসেনকে হত্যা করিয়াছি। আমার আদেশে জাফর, উজীর-পত্নীকে হত্যা করিয়াছে। খুনের পর হইতে আমি মহা অশান্তিতে কাল কাটাইতেছি, নিত্য নানা বিভীষিকা দেখিতেছি, নিত্য শত বৃশ্চিকদংশনে কাতর হইতেছি। আমার প্রতিহিংসাস্পৃহায় কেবল দুইটি প্রাণীর জীবননাশ হয় নাই, আবার এই দশজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি আমারই অপরাধের জন্য দণ্ডভোগ করিবেন। আমারই দোষে নায়েব বাবু ফেরার। আমার মন কহিতেছে, 'আমীর, সকল অপরাধ স্বীকার কর। বৃথা

এতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ করিও না, গৃহে গৃহে হাহাকার জন্মাইও না।' তাই, হুজুর, আমি স্বেচ্ছায় আপনার নিকট অপরাধ স্বীকার করিতেছি।"

উপস্থিত সকলেই অবাক্। জজ কিছুতেই আমীরের কথায় আস্থাস্থাপন করিতে চাহিলেন না। না চাহিলে ছাড়ে কে? মিষ্টার্ তরফদার জজ সাহেবকে কহিলেন, "মহাশয়, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমীরের স্বীকারোক্তি অবিশ্বাস করিলে বিচারের দোষ স্খালন হইবে না। সকল ব্যাপারই যথাস্থানে যথাসময়ে প্রকাশ হইবে।" ক্রোধে জজ সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন ও বিরক্তি সহকারে অধরদংশন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "তাইত, যদি এই ব্যক্তিই প্রকৃত হত্যাকারী ও দণ্ডিত ব্যক্তিগণ নির্দ্দোষী হয়, তবে কি লজ্জা, কি অপমান!" পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "মিষ্টার্ তরফ-দার, জিহ্বাসংযত করাই ভদ্রোচিত। এ ব্যক্তির কথাই যে প্রকৃত তাহার প্রমাণ কি? আগন্তুক পাগল।"

ব্যারিষ্টার। পাগল বৈকি? আপনার সিদ্ধান্ত বাহাল রাখি-বার জন্য উহাকে পাগল বলা আবশ্যক। কিন্তু, এইরূপে কি ধর্ম্মা-ধিকরণের গৌরব বাড়িবে? যে অপূর্ব্ব বিচারকৌশল দেখাই-য়াছেন তাহাতে লজ্জিত হওয়া উচিত। এখনও আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। অবিলম্বে আমীরকে পুলিশের হেফাজতে রাখুন।

জজ অবাক্, কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে। তিনি বাধ্য হইয়া আমীরকে পুলিশের জিম্মায় রাখিতে আদেশ করিলেন।

ধীরে ধীরে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। যথাসময়ে রায় প্রকাশ হইল। নিরপরাধ দশজন আসামী বেকসুর খালাস পাইলেন। আমীর ও জাফরের ফাঁসীর হুকুম হইল। নায়েব মহাশয়ের নামে যে ওয়ারেণ্ট ছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইল।

গৌরবিনোদ এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সঙ্গোপনে নন্দলাল ও উমেশের বাটীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্যালকের কীর্ত্তি সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জানাইলেন না।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### আগন্তুক।

ক্রমাগত চেষ্টায় নায়েব মহাশয় নন্দলালের বাটীর সন্ধান পাইলেন; কিন্তু দরওয়ানদিগের অনুকম্পায় প্রথম দুই তিন দিন নন্দলালের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন অনেক কষ্টে হিন্দুস্থানী প্রভুদিগের হাত এড়াইয়া বৈঠকখানা-কক্ষে নন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নন্দলাল ইয়ারগণ পরিবৃত হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাতকে হঠাৎ ঐরূপ অবস্থায় সম্মুখীন হইতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ইধার কোই হ্যায়?" মুহূর্ত্তকাল মধ্যে "হুজুর!" বলিয়া প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায় এক দীর্ঘাকার পুরুষ লম্বা সেলাম দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া শুনিয়া গৌরবিনোদ কহিলেন, "নন্দ, তোমার সহিত একটি কথা আছে।"

কেনারাম জিজ্ঞাসিলেন, "এ লোকটা কে হে?"

নন্দ। কোন প্রার্থী হবে। (দরওয়ানের প্রতি) শিও-রতন, কিস্‌কে হুকুমসে ইস্‌কো অন্দরমে আনে দিয়া?

শিওরতন। হুজুর হাম তো উস্‌কো কভি আনে নেই দেতাথা, লেকিন্ ও কিস্‌তরেসে আভি আগেয়া বোল্‌নে নেহি শক্তা।

নন্দ। চুপ্ রহো, শূয়ার!—নেকাল্ দেও ইস্কো।

শিওরতন "চল্ রে চল্" বলিয়া গৌরবিনোদকে ঠেলিতে লাগিল। গৌরবিনোদ তখনও কহিলেন, "নন্দ, একটি কথা শুন।" "চল্, বেইমান্" কহিয়া শিওরতন গৌরবিনোদকে ধাক্কা দিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। লাঞ্ছিত, অপমানিত ঘোষজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন ও মনে মনে স্থির করিলেন, "নন্দ ও উমেশকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে।"

গৌরবিনোদ চলিয়া গেলে যোগজীবন কহিলেন, "লোকটার আক্কেল দেখেছ? একেবারে রাজাবাবুর নাম ধ'রে ডাকিল বোধ হয়, আপনাদের দেশের লোক, মামা বাবু?"

ঘোষজাকে দেখিয়া উমেশের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "হ'তে পারে।"

নন্দ। দেখ্‌চ না, ঐ রকম কত প্রার্থীর জ্বালায় দিবারাত্রি জ্বালাতন হ'চ্ছি?

অতঃপর নন্দলাল কড়াকড় হুকুম দিলেন, ঐ লোকটিকে অথবা অপর কোন অপরিচিত লোককে তাঁহার বিনা অনুমতিতে যেন বাটীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

### পাপের পরিণাম।

গৌরবিনোদ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত উকীলের বাটীতে গেলেন এবং সকল ব্যাপার জানাইলেন। কিরূপে ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্যালককে শাস্তি দেওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ লইলেন। উকীল মহাশয়ের সহিত পুলিশ সাহেবের পরিচয় থাকায়, এক-জন সব্ ইন্স্পেক্টর ও জনকতক কন্ষ্টেবল সহ গৌরবিনোদ নন্দলালের বাটীতে সমুপস্থিত হইতে সক্ষম হইলেন। দরওয়া-নেরা লালপাগড়ী দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। অগ্রে গৌরবিনোদ, তৎপর দারোগা, তার পর কন্ষ্টেবলগণ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। নায়েব মহাশয়, নন্দলাল ও উমেশকে সনাক্ত করিয়া দিলে পুলিশ তাঁহাদের হাতে হাতকড়ি দিয়া থানায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। ব্যাপার দেখিয়া ডেপুটি কেনারাম, মিষ্টার্ স্যাণ্ডেল্ ও যোগজীবন খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। অপর ইয়ারগণ তখনও উপস্থিত হয়েন নাই। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে

লাগিলেন, "লোক দুইটা হয়ত জুয়াচোর।" জনৈক ঝি নূতন বড় লোকদিগকে শুনাইয়া কহিতে লাগিল, "আহা, বাছারা কেবল উড়্‌তে শিখেছিল। এর ভিতরই হাতকড়া পড়্‌লো। এখন বাপু কিছুদিন সরকারী খরচে খাও দাও গে।" অপরা কহিল, "রাজাবাবুদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে গো? হরিণবাড়ী?" এই সকল শেলসম উক্তি নন্দলাল ও উমেশের প্রাণে বাজিল। কিন্তু তাঁহারা এখন নির্ব্বাক্।

অতঃপর গৌরবিনোদ মালামাল ও টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করিলেন। সর্ব্বনাশ প্রায় বার আনা হইয়াছিল।

নন্দলাল ও উমেশ সমস্ত রাত্রি চিন্তা ও ক্লেশে কাটাইলেন। এক রাত্রে উভয়ের চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চেহারার ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উমেশ অবিরত কাঁদিয়াছেন, কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। তিনি কেবলই ভাবিতেছিলেন, "হায়, আমি কেন ভাগিনেয়ের ষড়যন্ত্রে যোগ দিলাম? বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলাম, এখন কোথায় চলিলাম? কে জানে কত কালের জন্য? উঃ! বুক ফাটিয়া যায়! ক্ষমা চাই, আমার অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাই।"

রাত্রিকালে নন্দলাল ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি যেন অনাহারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দারুণ তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে অট্টহাস্য করিতে করিতে কালীতারার

প্রেতমূর্ত্তি যেন তাঁহাকে আহ্বান করিল, 'আইস, সমুদয় বিষয় সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া এইখানে বাস করা যা'ক্।' তার পর নন্দলাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড। তাহাতে যমদূতেরা কতকগুলি লোককে জীবন্ত পুড়াইতেছে, তাহাদের আর্ত্তস্বরে কর্ণ বধির হইতেছে। নন্দলাল শিহরিলেন। এমন সময়ে কয়েক জন যমদূত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল ও ধরাধরি করিয়া সেই জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কালীতারা করতালি দিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন। নন্দলাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও যেন কালীতারার সেই বিকট হাস্য তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, নরকের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তখনও তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ বোধ হইতে লাগিল।

এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহারা শুনিলেন, ঘোষজা থানায় আসিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে ডাকিয়াছেন। তখনও উভয়ের হাতে হাতকড়ি ছিল। নন্দলাল ও উমেশ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, গৌরবিনোদ দারোগাকে কহিলেন, "ইঁহাদের হাতকড়া খুলিয়া দেওয়া হউক।" নন্দলাল স্থির, অচঞ্চল; উমেশের চক্ষু অশ্রুসিক্ত। উমেশ, নায়েব মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও "দোহাই

আপনার, আমায় জেলে দিবেন না” বলিয়া সকরুণ প্রার্থনা জানাইলেন। নন্দলাল চক্ষু নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না। তখন গৌরবিনোদ ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্যালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি তোমাদের ইষ্ট ব্যতীত কখনও অনিষ্ট করি নাই। তাহারই পুরস্কার স্বরূপে তোমরা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। যা'ক্—আর সে কথায় কাজ নাই। তোমাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকদিগকে বিহিত শাস্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি প্রতিহিংসা লইতে অনিচ্ছুক। ‘বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।’ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা, দুষ্কৃতের দণ্ডদাতা, তিনিই তোমাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দিবেন। আমি পুলিশের হাত হইতে তোমাদিগকে মুক্তি দিলাম। এখন নিজেদের পথ দেখ।” কেহ অনিষ্ট করিলে প্রতিশোধ লওয়া স্বাভাবিক। অপরে মন্দ করিলেও মন্দ না করা মনুষ্যোচিত, উপকার করা দেবোচিত।

নায়েব মহাশয় দারোগার হস্তে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক গুঁজিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও যথাশীঘ্র মোহনপুরে যাইবার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ঘোষজা চলিয়া গেলে নন্দলাল ও উমেশ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। এখন তাঁহারা নিঃসম্বল, গৃহহীন, পথের

কাঙ্গাল। তাঁহারা কোথায় যাইবেন? কে একমুঠা ভাত দিবে? অনেক ভাবিয়া তাঁহারা পদব্রজে ডেপুটি কেনারামের ভবনে গেলেন। কেনারাম অন্দরে ছিলেন। বকাউল্লা খবর দিল, "হুজুর সা'বের সহিত দেখা হইবার উপায় নাই।" বিষণ্ণ মনে তাঁহারা ছি, ছি, স্যাণ্ডেল ও হ্যারিডস্ পলের বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু তাঁহারা অসুখ করিয়াছে জানাইয়া আগন্তুকদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। হতাশ হইয়া নন্দলাল ও উমেশ যোগজীবনের বাটী গেলেন ও বন্ধুত্বের অনুরোধে দুইচারি দিনের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে যোগজীবন কহিলেন, "তোমাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত আবার বন্ধুত্ব কি? যে দু'দিন তোমাদের হাতে টাকা ছিল, আমোদ ইয়ারকি করা গিয়াছে। বুঝলে, সব টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ। মানুষের খাতির কিছু নয়। তাই বলিতেছি, বিনা বাক্যব্যয়ে এ স্থান ত্যাগ কর। বৃথা সময় নষ্ট করিতে আমি অক্ষম।"

নন্দলাল ও উমেশের শিরে বজ্রপাত হইল। তবে তে সব আশা ফুরাইল। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া কয়েক দিন চলিল। কিন্তু ভিক্ষাও সব সময় মিলে না। ক্রমে নন ও উমেশে ছাড়াছাড়ি হইল। যাঁহার যেখানে সুবিধা জুটিল তিনি একমুষ্টি অন্নের জন্য সেইখানে ছুটিলেন।

উদরে অন্ন নাই, কেশ রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন ও মলি

বস্ত্র,—দিন নাই, রাত্রি নাই, কে তোমরা 'একমুষ্টি ভিক্ষা দাও, বাবা!' বলিয়া সকরুণ শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতেছ? বলিহারি, নন্দ ও উমেশ, এইবার সাজিয়াছ ভাল। ইহজন্মেই পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তোমাদের শাস্তি না হইবে কেন? কিন্তু, ইহা কেবল আরম্ভ। পূর্ণাহুতির এখনও অনেক বিলম্ব।

বলিতে হইবে কি, পুণ্যপথে অনন্ত সুখ, পাপপথে অনন্ত দুঃখ? বলিতে হইবে কি, পরিণামে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী? যাহারা অসত্য ও অন্যায়কে একবার আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহারা মনে করে পাপের পথ বড় সুগম। প্রকৃতপক্ষে, তাহাই কি? একটি পাপে শতপাপের সৃষ্টি হয়, একটি পাপাচরণের জন্য সহস্র পাপাচরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। তার পর দুশ্চিন্তা, অশান্তি, ঘোরতর কষ্ট কে নিবারণ করিতে পারে? হায়, তবু লোকের চৈতন্যোদয় হয় না,—তবু লোকে বুঝে না, অধর্ম্মপথই পঙ্কিল!

এই পৃথিবী ভগবানের অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানা। ইহাতে কেহ ভস্ম মাখিয়া ভণ্ডামি ও অসাধুতার প্রসারবৃদ্ধি করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, কেহ চন্দন তিলক ও টিকিতে সুশোভিত হইয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে নানা বিভীষিকা সৃজন করিয়া, সরলবিশ্বাসী নরনারীকে সন্ত্রস্ত করিয়া অর্থার্জ্জনের সরল পন্থা আবিষ্কার করিতেছে, কেহ

দগ্ধোদরের জন্য পরের ধনপ্রাণ রক্ষার ছলে বাক্যজাল বিস্তার করিয়া যত্নর সম্পত্তি মধুকে দেওয়াইতেছে ও শ্যামের পরিবর্ত্তে রামকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া বিচারসহায়তা করিতেছে, কেহ নিরপেক্ষতার নামে ঘোরতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, কেহ শান্তিরক্ষা ছলে অশান্তির বীজ বপন করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরের সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনার কোষবৃদ্ধি করিতেছে, কেহ রোগের নিদান ও চিকিৎসা না জানিয়া পরের জীবন লইয়া খেলা করিতেছে ও জল-বটিকা-মিক্শ্চার প্রয়োগে পীড়াবৃদ্ধি ও প্রাণবধ করিয়া অর্থাগম করিতেছে, কেহ শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, দুর্নীতি ও নাস্তিকতা প্রচার করিতেছে, কেহ সারাজীবন মাছি মারিয়া সর্ব্বদা গরুড়ের ন্যায় প্রণত থাকিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে, কেহ দোকানদারি মহাজনির ফাঁদ পাতিয়া ক্রেতারূপী মক্ষিকাকে অহরহঃ ঊর্ণনাভে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ জমিদার বেশে দুর্ব্বল ও নিঃস্ব প্রজার রক্তশোষণ করিয়া চূড়ান্ত বিলাসিতা দেখাইতেছে। এইরূপ কপট সাধু, লোভী ও শাস্ত্র-জ্ঞান-বিরহিত গুরু, পুরোহিত ও পাণ্ডা, বিবেকহীন অর্থলোলুপ ব্যবহারজীবী, ধর্ম্মাধিকরণের কলঙ্কস্বরূপ দায়িত্ববোধহীন মূর্খ বিচারক, নরাকার জন্তুরূপী মনুষ্যত্ববর্জ্জিত উদ্ধত শান্তিরক্ষক, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ধনলুব্ধ চিকিৎসক, অধার্ম্মিক অশিক্ষিত শিক্ষক,

গ্রন্থকার ও সম্পাদক, ভীরু সেবারত স্বল্পবুদ্ধি মসীজীবী, প্রতারণাপূর্ণ অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী ও সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থপর জমিদার পৃথিবীতে বিরল নহে। কেন ইহারা এত পাপাচরণে অকু-ণ্ঠিত ?—এত অন্যায়, অধর্ম্ম, মিথ্যা, আত্মগরিমা, পরাপবাদ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যা, আত্মহত্যা কেন ?—ভাবিয়া দেখ, অসংখ্য লোক কিসের জন্য উধাও হইয়া ছুটিতেছে, কিসের জন্য এত হিংসা, দ্বেষ, কলহ, নীচতা, শঠতা, কারাবাস, অপমৃত্যু, শোণিতপাত মনুষ্যসমাজকে কলঙ্কিত ও বসুন্ধরাকে পীড়িত করিতেছে ? কোন্ দুইটি জিনিষের জন্য জগৎ মুগ্ধ, অধীর ও উদ্ভ্রান্ত ? হায়, বলিতে হইবে কি, সে দুইটি কেবল,—অর্থ ও রমণী ?

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

## পিতা ও পুত্রী।

এদিকে নায়েব মহাশয় মোহনপুরে আসিয়া যাহা দেখি-লেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। বৃহৎ বাটী জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, বিস্তৃত আঙ্গিনা ও মনোহর উদ্যানে ঘাস জন্মিয়াছে! কোথায় মালী, কোথায় দাসদাসী, কোথায় দরওয়ানগণ? কালীতারা ও কমলিনী কোথায়? দুই এক জন প্রতিবেশী আক্ষেপের সহিত জানাইলেন,—কালীতারা জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, কমলিনী কাশী গিয়াছেন। একে কষ্টসঞ্চিত বিপুল অর্থনাশ, তদুপরি এই নিদারুণ বার্ত্তা। নায়েব মহাশয়ের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিপদের উপর বিপদে, সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশে, তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইল। তাঁহার চক্ষে একবিন্দু জল নাই। হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে অশ্রু ব্যথিতের পরম সহায়। প্রাণে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে, বাসনা মিটাইয়া কাঁদিলে দুঃখ বা

শোকের তীব্রতা দূর হয়। সেই দুঃসময়ের সম্বল অশ্রুজলও নায়েব মহাশয়ের প্রতি বিরূপ হইল।

গৌরবিনোদ মোহনপুরে একদিন মাত্র ছিলেন। দুঃসম্বাদ প্রাপ্তির পর একবারও কাহার সহিত কথা কহিলেন না। ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা যেরূপ ভীষণ, নায়েব মহাশয়ের অবস্থা এখন সেইরূপ। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি কাশীযাত্রা করিলেন।

কাশীতে আসিয়া ঘোষজা কমলিনীকে দেখিতে পাইলেন। কমলিনী এতদিন পরে পিতাকে দেখিয়া বিষাদে ও উল্লাসে অধীরা হইলেন। তাঁহার মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা, চক্ষে অশ্রু। অভাগিনী পিতাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তবু কাঁদিতেছেন। কমলিনী কহিলেন, "বাবা, আপনাকে যে আর দেখিতে পাইব সে ভরসা ছিল না। ভগবানের কৃপায় আপনাকে ফিরিয়া পাইলাম।"

নায়েব। কমল, তুমিও যে আমায় ফাঁকি দিয়া পলাও নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য। আমার আর কিছুই নাই। ধনভাণ্ডার লুঠ হইয়াছে, বাড়ীঘর শ্মশান হইয়াছে, তোমার মা আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন,—আমি এখন জীবন্মৃত।

দরদরধারায় গৌরবিনোদের গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলিনীও

কাঁদিয়া আকুল। অনেক ক্ষণ কাঁদিলে নায়েব মহাশয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল,—কিন্তু জীবন থাকিতে এ শোক দূর হইবে কি ?

ঘোষজা ক্রমে জানিতে পারিলেন, কমলিনী নবপ্রতিষ্ঠিত এক আশ্রমে অনাথাদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। মোহনপুরে ফিরিয়া গিয়া আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবার প্রস্তাব করিলে, কমলিনী পিতাকে সংক্ষেপে কহিলেন, "আর মোহনপুরে গিয়া কাজ নাই।" নায়েব মহাশয় সবিষাদে কহিলেন, "হায়, যদি সুধীরকে জামাতারূপে পাইতাম! নিজের বুদ্ধি-দোষে আমি সব হারাইয়াছি।"

কিছুতেই কমলিনী মোহনপুরে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। বিশ্বেশ্বরের সেবা ও অনাথাদিগের শুশ্রূষায়ই এখন তাঁহার প্রকৃত আনন্দ। সংসারের কঠোর অভিজ্ঞতা, কন্যার সংদৃষ্টান্ত ও কাশীর মাহাত্ম্যে নায়েব মহাশয়েরও মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বাটী ও বিষয়সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া কাশীবাসের জোগাড় করিলেন। জমিদার তাঁহাকে পুনরায় কাজ করিতে অনুরোধ করিলে গৌরবিনোদ কহিলেন, "আমি পরমার্থের সন্ধান পাইয়াছি, আর অর্থ দিয়া কি করিব ?" দেশস্থ কেহ নায়েব মহাশয়ের বিপদে সহানুভূতি জানাইতে আসিলে তিনি কহিতেন, মোহনপুরের ক্ষুদ্র বাটীর বদলে এখন

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমার বাটী জ্ঞান করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি, সামান্য আত্মীয়স্বজনের পরিবর্ত্তে সকল লোককে আপনার ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। সব হারাইয়া যে বাবা বিশ্বনাথকে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। সেই পরমরত্ন লাভের জন্য কত ডুবুরী ডুব দিতেছেন; আমিও ডুব দিতে চাহি। তবে আমার শিক্ষা ও সাধনা নাই, এই দুঃখ। তবু চেষ্টা ছাড়িব না। যা' হোক্, অন্তিমের পূর্ব্বে যে আধ্যাত্মিক-বিষয়ে মতি হইয়াছে, ইহাতেই আমি সুখী। আর আমার অন্য সুখকামনা নাই।"

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

---

## সুধীরের ওকালতি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুধীরকুমার হুগলি কলেজে আইন পাঠ করিতেছিলেন। তিনি যথাসময়ে বি. এল্. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইলেন। এইবার মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, "সুধীর, এখন তবে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ কর। শুভস্য শীঘ্রম্।"

সুধীর। ওকালতি আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমেই যে অর্থব্যয় আবশ্যক আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। তার পর প্রথম প্রথম অনশনের পালা আছে।

দয়ারাম। শুন সুধীর, তোমার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের পশার হইতে কালবিলম্ব হইবে না। তোমার প্রশস্ত ললাট ও দীপ্তিশালী চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ। তোমার অদৃষ্টে প্রচুর অর্থাগম আছে। যদি আমাকে ভালবাসিবার উপযুক্ত পাত্র মনে কর, তবে আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমার ইচ্ছা, তুমি এই বাটীর

একাংশে থাকিয়া ওকালতি আরম্ভ কর। কক্ষাদি সাজাইবার ভার আমাকে দিলেই সুখী হইব। ভগবানের কৃপায় এখানে আমার যাহা কিছু প্রতিপত্তি আছে তাহাতে মকদ্দমা লাভের জন্য তোমার কোন কষ্ট হইবে না। ইহা ছাড়া, গৃহিণীর অনুরোধ, যতদিন তুমি আপনার পদগৌরবের তুল্য ব্যয় করিতে অসমর্থ হইবে, ততদিন তাঁহার ক্ষুদ্র তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ লইতে দ্বিধাবোধ করিও না। আমাদিগকে পর ভাবিও না, সুধীর! আমার পৌত্র দু'টির বিদ্যা ও চরিত্রে যে আশাতিরিক্ত উন্নতি হইয়াছে তজ্জন্য আমরা তোমার নিকট ঋণী।

সুধীর। ও কথা বলিবেন না। আমি আপনার আশ্রয় ও সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আপনাদের ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি তো কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি; আপনারা অযোগ্য পাত্রে যে অপরিসীম করুণা দেখাইয়াছেন তাহার উপর অধিক দাবী করিতে আমি ধর্ম্মতঃ অশক্ত।

দয়ারাম। তবে সুধীর, আমায় মনঃকষ্ট দিবে? গৃহিণীর মনে ব্যথা দিবে?

সুধীর অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিলেন, "আমায় মার্জ্জনা করুন। আপনি আশ্রয়দাতা, হিতৈষী, পিতৃতুল্য। আপনার দয়ায় আমি দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা ভুলিয়াছি। আপনাদের মনে

ব্যথা দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু বিবেকের উপদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিব? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি আর অর্থের প্রত্যাশী নহি,—আমি কেবল আপনাদের স্নেহপ্রার্থী।"

দয়ারাম। সুধীর, সংসার সম্বন্ধে তুমি এখনও অনভিজ্ঞ। "বৃদ্ধের বচন" শুন। ব্যবসায় আরম্ভ করিতে আর কাল-বিলম্ব করিও না।

এরূপ হিতৈষীর অনুরোধ কে উপেক্ষা করিতে পারে? সুধীর অগৌণে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এরূপ হিতাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ আদেশতুল্য, আশীর্ব্বাদ রক্ষাকবচ। এমন পর আত্মীয় হইতেও আত্মীয়, আপনার হইতেও আপনার। ব্যবহারেই আপন পর হয়, পর আপন হয়। কুলশাস্ত্র দেখিয়া ও কুটুম্বিতা নির্ণয় করিয়া অনেক জ্ঞাতিকুটুম্ব পাওয়া যায়, কিন্তু সুখে উল্লসিত, দুঃখে ব্যথিত, অভাবে মুক্তহস্ত, বিপদে সহায়, প্রকৃত আত্মীয়স্বজন সংসারে কয়জন? সহস্র আপন হইতে এমন একটি পর পাইলে জীবন ধন্য হয়, হৃদয় উন্নত হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়।

---

## ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

### নবদম্পতী।

সুধীর ওকালতি ব্যবসায়ে অচিরে বিশেষ অর্থাগম করিতে লাগিলেন। সাধারণের ভাগ্যে এত শীঘ্র এরূপ পশার হয় না। তিনি নিজ আয়ের এক তৃতীয়াংশ অনাথাশ্রমে পাঠাইতেন। অবশিষ্ট দ্বারা সচ্ছন্দে ও সসম্মানে সকলকে লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

সুধীরের মাতা, মল্লিক মহাশয়, মল্লিক মহাশয়ের গৃহিণী, শরৎ ও বিশালাক্ষী এখন সুধীরকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এত বড় ব্যূহের ভিতর সুধীরের ইচ্ছা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িল। বিবাহের প্রস্তাবে সুধীর শরৎকে কহিতেন, "ঐটি বাদে অন্য অনুরোধ কর।" শরৎ কহিতেন, "কেন বিবাহ করিবে না? যাঁহার জন্য জীবনটা নষ্ট করিতেছ তাঁহার উপর তোমার কোন দাবী নাই। প্রথমতঃ, তিনি বিবাহিতা,—কাজেই তোমাতে ও তাঁহাতে পূর্ব্ববৎ ব্যবহার অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিধবা হইলেও তুমি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী নও। আর, কমলিনীই কি

পুনরায় বিবাহ করিবেন? স্বীকার করি, প্রেমের প্রথম স্মৃতি বড় মধুর। তোমার জীবন-প্রভাতে যে কমলিনী ফুটিয়াছিল তাহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখ। কিন্তু সেই অপ্রাপণীয়া প্রণয়িনীর জন্য জীবন নষ্ট করিবে কেন? তুমি গৃহী। বিবাহ করিয়া নিজে সুখী হও, মাকে সুখী কর ও আমাদের আশা মিটাও। যে বিবাহ করে সে নানারূপে সমাজের উপকার করে, যে বিবাহ না করে তাহার দায়িত্ব বড় বেশী নহে।"

নিয়ত এইরূপ কথা, নিয়ত এইরূপ উত্তেজনা। পরিশেষে নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সুধীর সম্মতি জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিবাহ হইল বড় আশ্চর্য্য রকমের। রামতনু বসু হুগলিতে 'কণ্ট্রাক্টরি' করিতেন। তিনি জীবদ্দশায় গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া খুব জাঁক জমকে কালক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে, দেখা গেল, তাঁহার পরিবারবর্গের উদরান্নের কোন সংস্থান নাই, অধিকন্তু তাঁহাদের স্কন্ধে কতকগুলি ঋণভার চাপিয়াছে। রামতনু বসুর পরলোকপ্রাপ্তির পর প্রতিবেশিনীগণ বসুজায়াকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া কহিলেন, "হাঁ লো 'কন্টিকারী' করে' সকলেই তো বড় লোক হয়। তা' দিদি, তোর যে এমন মন্দ কপাল, কি করবি বল্।" রামতনুর দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়ঃক্রম আনুমানিক পনর কি ষোল। বিধবা, দুই কন্যা ও পুত্রকে লইয়া

যে কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আপাততঃ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ না দিলে সম্ভ্রম থাকে না। বিবাহের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা রামতনুর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশের পর ভাঙ্গিয়া গেল। হতভাগিনী কি করিবেন, কোথায় যাইবেন?

সুধীর উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শরৎকে কহিলেন, "দেখ, যদি আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চাও, তবে রামতনু বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পার।" শরৎ বুঝিলেন, বন্ধুর ইচ্ছা প্রতিহত করা নিষ্ফল। সুধীরের মা বিশেষ দুঃখিতা হইলেন। মল্লিক মহাশয় সুধীরের সদিচ্ছা প্রতিরোধ করা অনাবশ্যক মনে করিলেন।

৺ রামতনু বসুর স্ত্রীর অপরিসীম আনন্দ। যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। কৃতজ্ঞতাপ্লুতনেত্রে নববধূ অন্নপূর্ণা পতিগৃহে আসিলেন। স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সতী আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। সুধীর ধীরে ধীরে এই স্ত্রীরত্নের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

---

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

### বিপত্নীক।

সুখে দম্পতীর দিন কাটিতে লাগিল। বিবাহের দুই বৎসর পরে অন্নপূর্ণা একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিলেন। চারিদিকে আনন্দকোলাহল, চারিদিকে উল্লাসধ্বনি। এতদিনে বুঝি সুধীরের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। কি অর্থাগম, কি পারিবারিক সুখ কোন্ বিষয়ে তাঁহার অপ্রতুলতা? এমন অর্থ কয়জন রোজগার করিতে পারে? এমন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর পদার্পণে কোন্ গৃহ সমুজ্জ্বল? বস্তুতঃ, অন্নপূর্ণা আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী। সর্ব্বভূতে তাঁহার অসীম দয়া, অতিথি অভ্যাগতের পরিতোষণার্থ তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্তা, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবায় সদা যত্নবতী, রন্ধন-সূচীকার্য্য-শুশ্রূষা-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তিনি অতুলনীয়া।

কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। পৃথিবীতে চিরসুখী কে? এক বৎসর পর সুধীরের মাতৃবিয়োগ হইল। পরবৎসর অন্নপূর্ণা একটি মৃতসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল!"

হায়, অন্ধ নরনারি! মানুষের শরীরের এই ত ভরসা, মানুষের সুখ তো এইরূপ ক্ষণস্থায়ী! কখন যে কল বিগড়াইবে কে বলিতে পারে? কখন কাহার ডাক পড়ে কে জানে? মৃত্যু জগতের নিয়ম। বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য। তবু এই দেহের জন্য কত দ্বন্দ্ব, কত আশা, কত আস্ফালন! শুধু 'আমার' 'আমার' চিন্তাই সকল রোগের মূল। এ সংসারে কিছুই যে আমাদের নয় তাহা কেহ বুঝিয়াও বুঝে না।

সুধীর উদাসীন, তাঁহার মন উদ্‌ভ্রান্ত। কি করিবেন, কিসে শান্তি পাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

শাদা শাদা মেঘগুলি বাতাসে তূলার মত উড়িতেছে। সুধীর উহা দেখিতে দেখিতে মনে মনে কহিলেন, "আমরাও ঐ মেঘগুলির মত। কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি কে জানে?"

সুধীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুশীলকুমার বি. এল্. পরীক্ষা পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেষ্টায় তাঁহার প্রথম হইতেই বেশ সুবিধা হইতেছিল। পত্নী-বিয়োগের পর পুত্রকে ভ্রাতৃবধূর নিকট রাখিয়া সুধীর উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ইচ্ছা, শোক অপনোদন।

---

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

## অবগুণ্ঠিতা।

সুধীর হরিদ্বার-গোমুখী-জ্বালামুখী-পুষ্কর-বৃন্দাবন-প্রয়াগ-কাশী ভ্রমণ করিলেন। কাশীতে প্রত্যাগমন করিয়া রমাপ্রসাদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঋষিকল্প রমাপ্রসাদের সহিত কথাবার্ত্তায় মন অনেকটা শান্ত হইল। তার পর সুধীর তাঁহার সঙ্গে অনাথাশ্রম পরিদর্শন করিতে গেলেন। অনাথ-দিগের বিভাগ দেখা শেষ হইলে অনাথাদিগের বিভাগে গিয়া দেখিলেন, এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী নিবিষ্টচিত্তে নিঃসহায়া স্ত্রীলোকদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। অবগুণ্ঠিতা দেখিলেন, রমাপ্রসাদের সহিত একটি পরিব্রাজক আসিয়াছেন। এই পরিব্রাজক কে? সুধীর কি? স্মৃতি, অবলার সহায় হও,—ব্রহ্মচারিণীকে বলিয়া দাও, আগন্তুক সুধীর কি না! সন্দিগ্ধে, স্থির হও! তোমার পুরোবর্ত্তী পরিব্রাজক, সুধীরকুমার!

অবগুণ্ঠিতা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন। রমাপ্রসাদ ও সুধীর তাড়াতাড়ি তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করিলেন। সুধীর কাহাকে দেখিলেন? এ কি ভ্রান্তি? না, ভ্রান্তি অসম্ভব;

তাঁহাকে ভুলা অসম্ভব। সুধীর ভাবিলেন, "নয়ন, তোমায় বিশ্বাস হয় না, তুমি অনেক চাতুরী জান। মন, ঠিক্ বল, এই রমণী আমার সেই হৃদয়-প্রতিমা কি না? বল, বল, ইনি কি সেই সুধাময়ী, সেই মনোমোহিনী?" সত্যই অবগুণ্ঠিতা, কমলিনী। সুধীর অতি কষ্টে আত্মসংযম করিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত,—দৃষ্টিশক্তি রোধ হইবে নাকি? রমাপ্রসাদের নিকট সুধীর আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিবেন না কি? সুধীর, সাবধান! বুদ্ধিমান যুবক মন বাঁধিলেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়া কমলিনী চক্ষু মেলিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সুধীর তাঁহারই শুশ্রূষায় রত। চারি চক্ষু একত্র হইল। কমলিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। রমাপ্রসাদ পরিচারিকাকে তাঁহার যত্ন লইতে আদেশ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুধীরও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পরদিন সুধীর গৌরবিনোদের বাটীর সন্ধান করিয়া সায়াহ্নে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদুসিং বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। সুধীর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "যদুসিং, বাড়ীতে কেহ আছেন?"

যদুসিং। সেলাম, বাবুজী। কর্ত্তাবাবু বেড়াইতে গিয়াছেন, দিদিমণি বাড়ী আছেন। আপনি ভাল আছেন কি?

সুধীর। হাঁ। তোমরা সব ভাল তো?

যত্নসিং। আপনার মেহেরবাণীতে সকলে ভাল আছেন।

সুধীর। কমলকে বল, আমি তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।

"বহুৎ আচ্ছা" কহিয়া যত্নসিং অন্দরে গেল। পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "দিদিমণি আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

সুধীর গিয়া দেখিলেন, কমলিনী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। যুবতী তাঁহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল আছেন?"

সুধীর। আছি। তুমি কত দিন হইল আশ্রমের কাজে লিপ্ত আছ?

কমলিনী। প্রতিষ্ঠার পর হইতেই। আপনি কবে কাশী আসিয়াছেন? কোথায় উঠিয়াছেন?

সুধীর। চারি পাঁচ দিন হইল আসিয়াছি। রমাপ্রসাদ বাবুর বাটীতে আছি। কমল, তোমাতে আমাতে যদিও ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তুমি-আমি যদিও এখন পরস্ত্রী ও পরপুরুষ, তবু কমল, আমার কাছে কোন সঙ্কোচ বোধ করিও না। তোমাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তোমার কাছে 'আপনি' না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় 'তুমি' থাকিলেই সুখী হইব। একেবারে নিষ্ঠুর হইও না, কমল!

কমলিনী। সুধীর, কিরূপে বুঝাইব তোমার জন্য দিবানিশি

কত যাতনা সহিয়াছি ? তোমা-হারা হইয়া জীবনটা কেমন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছিল ! কিন্তু সুধীর, এখন আর সে আবেগ উচ্ছ্বাস নাই,—হৃদয়ে এখন অন্য ভাব জাগিয়াছে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমার সকল বিষাদ দূর হইয়াছে, আমি এখন তাঁহারই আদেশে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছি ও কার্য্যেই প্রকৃত সুখ পাইতেছি। অতীত স্মৃতি মুছিবার নয়। তোমাকে যদিও আমি নিতান্ত আপনার রূপে পাই নাই, তবু, সুধীর, বল, তুমি আমার চিরহিতৈষী বন্ধু ও উপদেষ্টা হইবে ?

সুধীর। আমি তাই, কমল, আমি তাই। তুমি আমার চক্ষে এখনও সেই দেবীপ্রতিমা। তবে পূর্ব্বে তোমায় হৃদয়ে লইতে ইচ্ছুক ছিলাম, এখন হইতে শিরে রাখিব। এখন হইতে আমরা দুইজনে ভগবানের নাম লইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কার্য্য করিব। কি পুরুষ, কি রমণী, আমরা সকলেই তাঁহার দাস দাসী,—আমরা সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ বিশ্ব-নিয়ন্তার আদেশপালনে চিরব্রতী থাকিব, তাঁহারই অভয় নাম স্মরণ করিয়া নিঃস্ব ও আতুরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব। ইহা হইতে আর কিসে অধিক সুখ ? তোমাতে-আমাতে আমি শরীরের সম্বন্ধপ্রত্যাশী নহি,—তোমাতেআমাতে এক লক্ষ্যসাধনে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিব, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

কমলিনী। সুধীর, বিশ্বেশ্বরের অপার দয়া। তিনি নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমাদিগকে সত্য পথ দেখাইয়াছেন। একমাত্র তিনিই ধন্য।

সুধীর। কমল, বাস্তবিক তিনিই ধন্য। আমরা একটি বালুকারেণু সৃষ্টি করিতে বা ধ্বংস করিতে পারি না। অথচ এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই সৃষ্টি। আমরা কত ক্ষুদ্র, তিনি কত মহান্। জয় ভগবান, সদানন্দ! মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, ভবার্ণবের কাণ্ডারী আমাদের সকলের আশ্রয়, সকলের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি আমাদিগের হৃদয়ে অমিত বল দিন্।

ইহার পর সুধীরের সহিত কমলিনীর অনেক কথা হইল। কথা আর ফুরায় না। উভয়ের বিচ্ছেদের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সে সকলই কহিলেন। সুধীরের বিপত্নীক হইবার সংবাদে কমলিনীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তিনি সুধীরকে কহিলেন, "এ জীবনে তোমায় পাইলাম না। আর আবশ্যকও নাই। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখিবে কি? খোকার প্রতিপালনের ভার আমায় দিবে কি?" সুধীর সম্মত হইলেন।

এমন সময়ে গৌরবিনোদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সুধীরকে দেখিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুধীর, এ কি স্বপ্ন? তুমি এখানে? আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। তোমাদের কষ্ট দিয়াই আমার অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল। তবে এখন আর আমার বিশেষ দুঃখের কারণ নাই। তোমরা যে সুখী হইতে পারিলে না, কেবল এই আক্ষেপ মনে রহিল।

সুধীর। ঈশ্বর যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁহার কৃপায় আমি পরম সুখে আছি।

কমলিনী। বাবা, আমারও কোন কষ্ট নাই।

গৌরবিনোদ। তবে আমারও নাই। জয় বিশ্বেশ্বর!

# উপসংহার।

ঘোষজা সুধীরকে তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু সুধীর কোন ক্রমে তাহাতে সম্মত হইলেন না। কেবল সংক্ষেপে কহিলেন, "ঋষিকল্প রমাপ্রসাদের নিকটে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা আমার অভিপ্রায়।" বস্তুতঃ, প্রলোভনের বাহিরে থাকাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

পাঠকপাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নন্দলাল ও উমেশের কি হইল? কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নন্দলাল অনশনে ও অর্দ্ধাশনে শীর্ণকায় হইতে লাগিলেন। কোথায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, কোথায় বৃক্ষতলে নিশাযাপন! কোথায় রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ অভিনব আহারীয়, কোথায় সামান্য তণ্ডুলকণার অপ্রতুলতা! কোথায় নানা পারিপাট্যযুক্ত বেশভূষা, কোথায় ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র! নন্দলাল শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অর্থই জীবনের একমাত্র বন্ধু নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী। একদিন দেখা গেল, ঠনঠনিয়ার মোড়ে নন্দলাল অর্দ্ধমৃতবৎ পড়িয়া আছেন ও 'জল' 'জল' শব্দে কাতরোক্তি করিতেছেন। তাঁহার

স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ। একটি লোক জল আনিয়া দিল। কিন্তু নন্দলালের প্রাণবায়ু শীঘ্রই বহির্গত হইল। উমেশের কথা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কেহ তাঁহার কোনও সন্ধান পায় নাই।

ইহার পর সুধীরের কথা। তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হইলেন। খোকা কমলিনীর নিকট রহিল। সুশীলকুমারের বেশ পসার হইতে লাগিল। শরৎ ও বিশালাক্ষী মধ্যে মধ্যে বন্ধুর বাটীতে আসিয়া আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করিতেন। বিমল আনন্দে রমাপ্রসাদ, সুধীর, কমলিনী ও গৌরবিনোদের দিন কাটিতে লাগিল।

ভক্ত রমাপ্রসাদ শিষ্য সুধীরকুমারকে যেরূপ উপদেশ দিতেন আমরা পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা শেষ করিব।

রমাপ্রসাদ সুধীরকে কহিতেছেন, "জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের পূর্ণ বিকাশে সিদ্ধি সম্ভবপর। কেননা, মুক্তিপথে উড়িবার জন্য জ্ঞান ও ভক্তি দুই পক্ষ ও যোগ পুচ্ছ আবশ্যক। তবে, এই তিন প্রকার সাধন আয়াসসাধ্য বলিয়া সাধারণের পক্ষে ভক্তিই সহজ পথ। পতিপ্রাণা স্ত্রী যেরূপ তদ্গতচিত্তে পতিকে ধ্যান করেন, সাধকও সেইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানকে

নিরন্তর স্মরণ করিবেন। এই নিরন্তর স্মরণই ভক্তি। শাণ্ডিল্যের মতে, ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি,—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অনু—পশ্চাৎ, রক্তি—আসক্তি। 'ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনুপশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্'। অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা জ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি জন্মে তাহাই অনুরক্তি। ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও প্রতি আসক্তি ভক্তি নয়। 'যে যাহা বলে শুন, সকলের সঙ্গে ব'স, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর', কিন্তু কখনও লক্ষ্যহারা হইও না, সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতু অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ ভগবানকে কখনও ভুলিও না। অশিক্ষিতেরা ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিতেরা জ্ঞানচর্চ্চায় তৃপ্ত, ভক্তেরা ভগবৎপ্রেমে সুখী। সুধীর, ইন্দ্রিয়সংযম ও ত্যাগশিক্ষা কর। একচক্ষু হরিণের ন্যায় কেবল একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া বাহ্যশৌচ বাদে অন্তঃশুদ্ধি বিষয়েও লক্ষ্য রাখ। 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।' সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, শুভকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। তুমি জ্ঞানী; তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রিয়। ভগবান্‌কে ভালবাসিবে তো জগৎকে ভালবাস। কেননা, জগৎ তাঁহারই। যাহাতে সমস্ত জগতের কল্যাণ হয় সেইরূপ কার্য্য কর। আর,

'তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।'

সুধীর, তাঁহার বিষয়ে,—কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর। তিনি সকল সুখের আধার, সকল শান্তির আকর। উপনিষদে তিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচম্। স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার পরম দেবতা, সকল পতির পতি। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি আনন্দময়, তিনি সত্য, তিনি অমৃত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, কারণের কারণ, সকলের প্রভু, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহৃৎ। 'অদৃষ্টোদ্রষ্টা হশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা', তাঁহাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। তাঁহার নিকট জ্ঞান চাও, বুদ্ধি চাও; মোহ ও পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাক। সেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য

পাগল হও। এ সংসারে পাগল নয় কে? কেহ ধনের জন্য, কেহ জনের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ পুত্রকলত্রের জন্য, কেহ ভোগের জন্য, কেহ মোক্ষের জন্য, কেহ লাভের জন্য, কেহ ত্যাগের জন্য, কেহ আপনার জন্য, কেহ পরের জন্য, কেহ দেশের জন্য, কেহ বিদেশের জন্য, কেহ আসলের জন্য, কেহ নকলের জন্য পাগল। পাগল সকলেই। সুধীর, ভগবৎপ্রেমে পাগল হও।"